পঙ্কজিনী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক টাকা চারি আনা

প্রকাশক—
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দীপালী কার্য্যালয়
২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১২৩।১ নং আপার সার্কুলার রোডস্থ
'দীপালী' প্রেস হইতে
শ্রীসিদ্ধেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

এই গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট গল্পগুলি ইতিপূর্ব্বে প্রবাসী, সচিত্র শিশির, মানসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতি ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২, শ্রীশ্রীদশহরা।

১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
১১ই জুন, ১৯৩৫

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচী

অনুজোপম-বন্ধু

"চন্দ্রশেখর" নামে খ্যাত

শ্রীমনুজেন্দ্রনাথ ভঞ্জের

করকমলে—

——:o:——

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ওলো ও আংরি, ও মুখপুড়ী, শীগ্‌গীর আয়, শীগ্‌গীর আয়—শুন্‌সে লো, শুনে যা—"

আনন্দে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া, ঘর হইতে ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে আসিয়া, দোতলার বারান্দার রেলিং-এ ঝুঁকিয়া বড়দিদি ছোট ভগিনীকে ডাকিল। নীচে কলতলায় কনিষ্ঠা সাবান মাখিয়া স্নান করিতেছিল। কলের মুখে একটি বাল্‌তি পাতা, তাহা হইতে জল উপচিয়া পড়িতেছিল।

মুখমণ্ডল সাবানের জমাট ঘন ফেণায় আবৃত; কনিষ্ঠা চক্ষু বুঁজিয়া, উপর দিকে মুখ তুলিয়া কহিল—"আ মর মাগী, ক্ষেপ্‌লি নাকি? দাপিয়ে ঝাঁপিয়ে চেঁচিয়ে একেবারে পাড়া মাৎ কর্‌লি যে।"

জ্যেষ্ঠার আদেশ প্রতিপালন করিতে কনিষ্ঠার কোনও উৎসাহ দেখা গেল না, বরং সে ধীরমন্থরগতিতে যেমন অঙ্গরাগ করিতেছিল, তেমনই

করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা কোনও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া, বহুপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল—কনিষ্ঠা তাহা জানিতে পারে নাই।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম বেদানাসুন্দরী, কনিষ্ঠার নাম আঙুরবালা। বেদানার বয়স প্রায় বিশ বৎসর, আঙুরের বয়স চতুর্দ্দশ। উভয়েই গৌরবর্ণা ও স্বাস্থ্য-সম্পন্না। এক কথায় দুই-ভগিনীই সুন্দরী-পদবাচ্যা!

প্রেমচাঁদ বড়ালের গলিতে ছোট দ্বিতল বাড়ী। উপরে তিন খানি ঘর, নীচে দুইখানি, কল এবং পায়খানা। নীচের ঘর দুইখানি ভাণ্ডার ও রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়, উপরের তিন খানি বাসের। এক খানিতে এই দুই ভগিনীর জননী কুসুমকুমারী থাকে। সেখানি পূর্ব্বদিকের টেরে, সিঁড়ি হইতে উঠিতেই। মাঝের খানি বেদানার বসিবার ও তৃতীয়খানি জ্যেষ্ঠারই শয়নকক্ষ। ঘরের মধ্যেই দুয়ার আছে, ঘরে ঘরে যাতায়াতও চলে। আঙুর মাতার ঘরেই শয়ন করে।

কুসুমের ঘরের মেঝেয় মাদুরে বসিয়া, শহরের বিখ্যাত ঘটক বটুক আচার্য্য। পাশে উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব বেদানা। কুসুম স্থিরভাবে আশঙ্কিত বদনে কন্যার দক্ষিণে পানের বাটা কোলে করিয়া উপবিষ্ট। ঘটক অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে চিন্তিতভাবে সিগারেট ধূম পান করিতেছিল।

কুসুম মুখে খানিকটা দোক্তা ফেলিয়া দিয়া কহিল—"দেখবেন্ আচায্যি মশায়, শেষটায় যেন বিপদে না পড়ি।"

বেদানা বলিল—"হাঁ, অতি-লোভে তাঁতা যেন ডোবে না, বাবা।"

বটুক আশ্বাস দিয়া, সজোরে মাথা নাড়িয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল—"আরে রাম কহ, তোমাদিকে আমি বিপদে ফেল্‌ব? তোমরা

আমার কি পাকা ধানে মই দিয়েচ? হেঁঃ, আরে, বুঝচো না—তোমাদের বিপদ হ'লে, আমার মাথাটাই যে আগে যাবে?"

কুসুম ও বেদানা উভয়েই সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিল।

বেদানা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, আচায্যি মশাই, এ বিয়েতে লোক-লস্কর প্রোছেশন বরযাত্রী বামুন পুরুৎ সব আসবে ত—তারা কিছু জান্‌তে পারবে না? যদি তারা টের পায়, তাহলে কি হবে?"

আচার্য্য সহাস্যে উত্তর দিল—"দূর ক্ষেপি! তা' হলে কি আর শর্ম্মা-রাম এ কাজে হাত দিত? সে সব উপসর্গ কিছু নেই বলেই তো এই মতলব এঁটেচি, রাতারাতি কিছু কামিয়ে এই শহর হতে শেষ খেয়া দেব। চিরকালটাই কি খাটব? হেঁটে হেঁটে দেখ্‌চ—পায়ে কি রকম সব শির উঠেচে?" বলিয়া বটুকচন্দ্র শ্রীচরণযুগল আগাইয়া দিল—তাহাতে দেখা গেল, প্রত্যেক পায়ে প্রায় এক ইঞ্চি মোটা চার পাঁচটি করিয়া শিরা বিরাজ করিতেছে।

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে কি রকম হবে?"

বটুকের মুখবিবরে সিগারেটটি প্রায় অর্দ্ধেকখানা প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ভিজিয়া যাওয়ায়, সিগারেটটি নিভিয়া গিয়াছিল, সেটিকে ফেলিয়া দিয়া বটুক কহিল—

"বুঝচো না? এতো আর কুলীনের বিয়ে নয়, এরা হচ্ছে বংশজ। এদের টাকা দিয়ে বিয়ে করতে হয়, বুঝলে? তা ছাড়া, এদের ঘরের মেয়ে পাওয়া এক মহাদুষ্কর ব্যাপার। সে বাবুর আর কোনও ছেলে নাই কেবল একটা মেয়ে আছে মাত্র। তার বিয়ে টিয়ে কবে কোন দিন হয়ে' গেছে; জামাইটাও নাকি এই কলকাতাতেই থাকে, কী একটা কাষ

করে! মেয়ের ছেলেপুলে এখনও কিছু হয় নাই! তাই এখন এদের ইচ্ছে, যে বুড়োর যা' কিছু আছে—আসুন আসুন উকীলনী মহাশয়া আসুন—" বলিয়া বটুক আসল কথা ছাড়িয়া দিয়া সন্থাস্নাতা এলায়িত ঘনকৃষ্ণকুন্তলা আঙুরবালাকে অভ্যর্থনা করিল।

আঙুর একটু হাসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, বলিল—"মরণ আর কি? বুড়ো মিন্‌সের ঢং দেখে বাঁচি না।"

কুসুম গৃহের কোণ দেখাইয়া দিয়া কহিল—"ঐখানে খাবার আছে খা।" আঙুর দুইখানি জিলাপী ও একখানি সিঙ্গারা খাইয়া, একটা পান মুখে দিয়া, একটু জর্দ্দা মুখে ফেলিয়া, একটা সিগারেট ধরাইয়া, এলায়িত চুলে জানালার গরাদেতে ঠেশ দিয়া, জানালার তলবেদীতে পা ঝুলাইয়া বসিল।

বটুক কহিতে লাগিল—"হাঁ, মেয়েটার ছেলেপুলে কিছু নেই কি না, তাই তার মতলব যে বাপ আর বিয়ে থাওয়া না করে—কি জানি যদি ছেলে টেলে কিছু হয়, তা হ'লে এত বড় সম্পত্তিটা হাতছাড়া হয়ে যাবে ত? আর এই জন্তেই সে ছুঁড়ীটা তার স্বামীকে সুদ্ধ নিয়ে এসে, বুড়োর ঘাড়ে জাঁতা দিয়ে, তার বাপের বাড়ীতেই রয়েচে এখন।"

বেদানা বলিল—"আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে বটে তো? করলেই বা বাপ বিয়ে—তোর কী? আ মর্।"

বটুক বলিল—"বাজে কথা বলো না, দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার। আমি কথার খি হারিয়ে ফেল্‌চি। কি বল্লাম? হাঁ, মেয়েটা এখন এই বুড়োর কাছেই আছে, যাতে সব সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়, বিয়ে না হয়, এই অভিপ্রায়। এদিকে, বুড়ো বিয়ে করবে বলে একেবারে ক্ষেপে উন্মাদ হয়ে

উঠেচে। যেমন করে' হোক, বিয়ে সে করবেই। অথচ, মেয়েকে ভয়ও বিলক্ষণ আছে। কাযেই, সব চুপিচাপি কায হচ্ছে। এমন কি, আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বাড়ীতে হয় না। কথা হয়, হয় গোলদীঘির পাড়ে, নয় হেদোর ধারে। এই দেখ' না, সে দিন কথা কইতে নিরিবিলি জায়গা আর পাওয়া গেল না, শেষটা ধর্ম্মতলার মোড়ে ট্রামডিপোতে গিয়ে তবে আমরা কথা কই।"

কুসুম—"বটে?"—(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) তা' পর—টাকাকড়ির কথা কি হ'ল, বল—"

বেদানা বলিল—"হাঁ, আসল কথা বল'।"

বটুক বলিল—"তা বল্‌চি গো—এখন তুমি রাজী তো? তা' হলেই সব ঠিক!"

কুসুম বলিল—"হাঁ, রাজী আমি আছি, মেয়েটা যদি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে—আর নগদ যদি কিছু অমনি পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি?"

বেদানা বলিল—"তা' নয়? আর সে বুড়োই বা কদ্দিন? সে মরলে আংরিরই তো সব।"

বটুক বলিল—"তা তো ঠিক, তা তো ঠিক। বুড়োর বয়স এখন এই আমাদের মতই হবে, কি কিছু বেশীও হতে পারে। আমার এখনও ষাঠ হয় নাই, তার হয় ত হয়েচে। যাক্—তুমি যখন রাজী, তখন তোমায় সব কথা খোলাশা করেই বলি, শোন'। সে নগদ দশ হাজার টাকা দেবে, আমি বলেচি যে, তারা বড় গরীব কিছু টাকা চায়। তাতে সে দশ হাজার নিজেই বলেচে! আমার কিন্তু পাঁচ হাজার। এতে তুমি রাজী আছ?"

দশ হাজার টাকার কথা শুনিয়া কুসুমের বুকটা প্রথমে যেমন

লাফাইয়া উঠিয়াছিল, শেষে বখরার কথা শুনিয়া তেমনি দমিয়া গেল। বলিল—"একেবারে আধাআধি? কিছু কম-সম করে নাও। দেখ, প্রথমে ত আমায় মহাগণ্ডগোলে পড়্‌তে হবে হুকুমীচাঁদ বাবুর কাছে। তা সে আমি এক রকম করে মানিয়ে নেব, না হয় তার টাকাটা ফেরৎই দোব, আর কি?"

বটুক জিজ্ঞাসা করিল—"হুকুমীচাঁদ বাবু আবার কে?"

কুসুম বলিল—"হুকুমীচাঁদ একজন মাড়োয়ারী, বেদানার বাবু বদ্রীরাম বাবুর কেমন খুড়তুতো না জেঠ্‌তুতো শালা হয়। সে পাঁচশো টাকা আমায় দিয়ে রেখেচে, আঙুরের জন্যে। আঙুরকে বাড়ীও কিনে দেবে বলেচে। সে প্রায়ই আসে বদ্রীর সঙ্গে, খোঁজখবর নিয়ে যায়। ছেলেটি ভাল। বেশ বুদ্ধি-সুদ্ধি। ছেলেমানুষ, এই বছর ২০।২১ বয়স। তার বাপের গদী আছে বড়বাজারে।"

বটুক চিন্তিত হইয়া বলিল—"তবেই তো মুস্কিল বাধালে, দেখচি। শেষটা কি বিপদে পড়্‌ব নাকি? সে বাবা মাড়োয়ারী—এক পয়সা তার মা-বাপ। পাঁচ-পাঁচশো টাকা—সে কি ছাড়্‌বে?"

বেদানা স্পর্দ্ধার সুরে কহিল—"তার বাবা ছাড়বে—সে ভার আমার রইল। আজই আমি সব বন্দোবস্ত করে ফেল্‌চি, দেখ'।"

বটুক বলিল—"দেখ' বাপু, পৈত্রিক প্রাণটা যেন বাঁচে।" বেদানা ও কুসুম উভয়েই বটুককে অভয় দিল।

বটুক জিজ্ঞাসা করিল—"তা' হলে, হাঁ গো, সে আসল কথার কি?"

বেদানা আপাততঃ পাঁচহাজার ও অনতিদূর ভবিষ্যতে বহু টাকার সম্পত্তি, প্রকাণ্ড বাড়ী, মোটরকার ও কোম্পানীর কাগজের আশায়

আত্মবিস্মৃত হইয়া, কতকটা প্রফুল্ল চিত্তেই বলিল—"আচ্ছা, তাই সই। লাগেঃ !"

বটুক নিশ্চিন্ত হইয়া, সবিশেষ আরাম অনুভব করিল। স্থির হইল, শীঘ্রই ভাল পল্লীতে এক মাসের জন্য একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া, সেখানে উঠিয়া গিয়া যত শীঘ্র সম্ভব শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

বটুক বাসা ঠিক করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ব্যবসা বাণিজ্য যেমন এখন মাড়োয়ারী-সমাজের একচেটিয়া, তেমনি গণিকাদের অধিকাংশও এখন তাহাদেরই অধিকৃত। এই সহরে বাঙ্গালী, গুজরাতী, ভাটিয়া প্রভৃতি যখন যে জাতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে, তখন ইহারাও তাহাদের অন্তগত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ এ সমস্যা সমাধান করিবেন।

বিখ্যাত ধনী রায় বাহাদুর হনুমানদাস কিস্কিন্ধওয়ালার পৌত্র বদ্রী-রাম বেদানাকে বার হাজার টাকা দিয়া এই বাড়ী খানি কিনিয়া দিয়াছে ও তাহাকে মাসিক ৩০০৲ টাকা দিয়া, তাহার মাতা ও ভগিনীকে প্রতি-পালন করিতেছে। সে পিতৃহীন, বৃদ্ধ পিতামহের নয়নমণি। বৃদ্ধের আর কেহই নাই।

বদ্রীরামের বয়স প্রায় ২২।২৩ বৎসর। ঘরে তাহার স্ত্রী, মাতা ও অন্য দু'একজন আত্মীয়া মাত্র আছে।

রাত্রি নয়টার কম বদ্রী আসিতে পারে না—কারণ, বৃদ্ধ হনুমানদাস তাহাকে সন্ধ্যার পর কাজকর্ম্ম ও হিসাবপত্র লিখিতে শেখায়। জগতে নিছক দুঃখ কোথাও নাই। সুতরাং এ কাজে বদ্রীরও তাহা ছিল না। সন্ধ্যা লাগিতেই, তাহার মন যদিও বেদানার বাড়ীতেই পড়িয়া থাকিত, এবং প্রিয়তমার বিরহ-যাতনায় অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইত, তথাপি তাহার

সান্ত্বনা ছিল, এই সুযোগে সে কিছু টাকা আত্মসাৎ করিতে পারিত। এই সুবিধাটুকু না থাকিলে বদ্রীরাম কি করিত বলা যায় না।

যথা সময়ে বদ্রীরাম তাহার শ্যালক হুকুমীচাঁদের সঙ্গে বেদানার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। কক্ষে ঢুকিয়া দেখে, শয্যার এক প্রান্তে অকৃত-সান্ধ্য-সজ্জা বেদানাসুন্দরী ম্লান মুখে বিড়ালটিকে কোলে করিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া নীরবে আদর করিতেছে। দ্বারদেশে নাগরযুগলকে একবার দেখিয়াই, দৃষ্টি অবনত করিয়া পূর্ব্বারব্ধ কার্য্যেই পুনরায় মনঃসংযোগ করিল—কিছু বলিল না। শুধু মুখের কথা—'এস', তাহাও বলিল না।

বদ্রীরাম প্রণয়িণীর এরূপ মান কখনও দেখে নাই—আর সে হয়ত জানেও না—তাই বিস্মিত হইয়া দুয়ারেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না। একটু পরেই বেদানা বিড়াল-শিশুটিকে বক্ষে করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

বদ্রীরাম বহুদিন কলিকাতায় বাস করিতেছে। ভিতরে যাহাই থাকুক, উপরটা বাঙ্গালীর মত করিতে সে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করে নাই। এমন কি —হঠাৎ দেখিলে, যাবৎ-কিঞ্চিন্ন-ভাষতে, তাহাকে চেনাই যায় না যে, সে মাড়োয়ারী। বন্ধু-শ্যালককে বসিতে বলিয়া সে বেদানার পিছু পিছু গেল।

বেদানা বলিল—"তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, ছাদে এস।"

বদ্রীরামের বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। মন্ত্র-চালিতের মত সে বেদানার পশ্চাদনুসরণ করিল।

আকাশভরা তারা মাথার উপর মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল

পথিপার্শ্বস্থ চতুর্দ্দিকের আলোর ছটা পড়িয়া ছাদটি আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বেদানা বিরস বদনে, যেন সর্ব্বনাশ হইয়াছে এমনি ভাঙা গলায়, বলিল—"আমি কার? তোমার, না তোমার ঐ বন্ধুর?"

বদ্রী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সেকি? তুমি বন্ধুর, তার মানে?"

বেদানা বলিল—"তার মানে? তুমি কা'ল যখন একটু বেএক্তার হয়ে পড়েছিলে, তখন তোমার ঐ বন্ধুটি—আমার অঙ্গস্পর্শ করে,' জবরদস্তি আমায় অপমান করেছিল—তা' তুমি দেখেছিলে?"

বদ্রী জানাইল—"না"।

তাহার চক্ষু দুইটি স্থির নিষ্পলক। ওষ্ঠ দুইটি ঘন ঘন নড়িতেছিল।

বেদানা বলিল—"তা' দেখ্‌বে কেন? অবিশ্যি ওতে আমার আর কি? তোমার কি অপমান করা হ'ল না? এই তোমার বন্ধু? তুমি গলায় দড়ি দিয়ে মর'গে! সে দিন অম্‌নি আঙ্‌ুরকেও কি বলেছিল—সেই জন্যে সে আজ ঘর থেকেই বেরুলো না। অবিশ্যি, আঙ্‌ুরের কথা না হয় ছেড়ে দাও! আমার যে এতে——"

বেদানা আর বলিতে পারিল না, দুঃখে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। সে ফোঁপাইতে লাগিল।

বদ্রী গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া, কহিল—"জানি না, তোমাদের মাড়োয়ারীদের কি ব্যাভার। আমাদের বাঙ্গালী হলে এতক্ষণ ত' খুন-খারাপা হয়ে যেত। আমার গায় হাত দেওয়া, আর তোমার স্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়ায় কি কোনও তফাৎ মনে কর' তুমি? যদি আপনার এই

ইজ্জৎটুকু না রাখ্‌তে পার,' তবে আমার কাছে তো নয়ই, অন্য কোনো মেয়েমানুষের বাড়ীই তুমি আর যেয়ো না। ছিঃ—তোমরা এমন সব ইতর।"

প্রণয়িণীর নিকট ইহাই যথেষ্ট। বদ্রী আর কোনও কথা না বলিয়া দুপ্‌দাপ করিয়া নামিয়া একেবারে কক্ষ মধ্যে ঢুকিয়াই হুকুমীচাঁদকে সেই শ্রবণবিদারণ দংষ্ট্রাদমন উপল-বিষম-শ্রুতি মাড়োয়ারী ভাষায় কি বলিল। হুকুমীও উগ্রভাবে তাহাকে উত্তর দিল। বদ্রী সজোরে তাহার মস্তকে এক ঘুঁসি বসাইয়া দিল—সে বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নীচে গিয়া বীরত্বব্যঞ্জক আস্ফালন জুড়িয়া দিল। বদ্রীও খালি পায়ে দৌড়িয়া নীচে গিয়া তাহার গলদেশ ধরিয়া এমন ধাক্কা দিয়া তাহাকে বহিস্কৃত করিয়া দিল যে, সে একেবারে পথিমধ্যে সজোরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। বদ্রী সদর দুয়ারে খিল দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কুসুম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ বাবা, হুকুমীকে তাড়িয়ে তো দিলে, তার টাকা গুলো তা'হলে ফেরৎ—"

বদ্রী উত্তেজিত হইয়াছিল। সে উগ্রভাবেই উত্তর দিল—"না—না—টাকা ফেরৎ কিসের? টাকা দিয়েচে সে শালার সাক্ষী কে?" বলিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বেদানাকে একটি ছুঁড়িয়া দিয়া, নিজে একটি ধরাইল।

কিয়ৎক্ষণ বাড়ীটি নীরব হইয়া রহিল। বেদানা এতক্ষণ মুহ্যমতী হইয়া বসিয়াছিল, তাহার বিরস বদনে অল্পে অল্পে সরস কৌতুকের আভা ফুটিতে লাগিল। সে উঠিয়া আল্‌মারী খুলিয়া, কত কি সব খট্‌খট্‌ করিয়া নাড়িতে লাগিল।

বদ্রী বলিল—"নাও—পাপ বিদেয় হয়েচে ত' এখন? এইবার দাও একটু, মারা গেলুম,—" বেদানা এই আদেশের অপেক্ষাতেই ছিল। তৎক্ষণাৎ বোতল গেলাস বাহির হইল। দশ মিনিট পরেই উচ্চ হাস্যে, অনর্গল প্রেমনিবেদনে ও অকারণ বীরত্ব-আস্ফালনে কক্ষটি সরগরম হইয়া উঠিল।

বেদানা ডাকিল—"মা, কারী হয়ে থাকে তো দিয়ে যাও।"

বদ্রী বলিল—"আজও ফাউল্ কারী নাকি?"

বেদানা চক্ষু পালটিয়া, সরস হাসিয়া, বদ্রীর কোলে মাথা দিয়া শয়ন করিয়া কহিল—"না শুয়োরের। এতদিন কলিকাতায় আছ,' এখনও সভ্য হলে না? আ তোমার ভাল হোক—একেবারে গাড্ডি গাড্ডি ছাতুখোর কি না!"

বদ্রী বলিল—"আমি না খেলুম কবে? তবু আমাদের অপবাদ রটাবে?" বলিয়া সাদরে তাহার গাল টিপিয়া দিল।

বেদানা তাহার চিবুক ধরিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কহিল—"এই যে আমার বাঁদররাম শিখেচে—শিখেচে—শিখেচে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বহুবাজারের হিদরাম বাঁড়ুয্যের গলিতে ছোট একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, বটুক আচার্য্য আসিয়া কুসুমকে জানাইল—বাড়ী ঠিক, এখন সেখানে উঠিয়া গেলেই হয়।

সামান্য কিছু গৃহস্থালীর তৈজস পত্র লইয়া কুসুম ও আঙুরবালা গিয়া নূতন গৃহে বসবাস আরম্ভ করিল। বেদানা নিজ বাটীতেই থাকিল। কুসুম বেদানাকে তুই বেলা ভাত দিয়া আসিতে লাগিল।

বটুক বলিল—"পরশু দিন বিকেলে বাবু আস্‌বেন ক'নে দেখতে। যদি পছন্দ হয়, তবে একেবারে দিন পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে যাবে। সঙ্গে আস্‌বে শুধু ভট্‌চায। আজ কালের মধ্যেই একটা বামুন ঠিক করে রেখো যেন। আমি আবার আস্‌ব, বন্দোবস্ত সব ঠিকঠাক হ'ল কিনা দেখে, তবে তাঁদিকে আন্‌তে যাব। আর শোন,'—একটা কথা তোমায় বলে দিয়ে যাই, সেটা বেশ করে সেধে রাখ্‌বে।"

কুসুম ও বটুক কক্ষান্তরে গেল। আঙুর একাকিনী বসিয়া রহিল।

তাহার মন একটা অপূর্ব্ব কৌতুক রসে পরিপূর্ণ ছিল। বিবাহের নামে তাহার এতদিন কেবল হাসিই পাইত, এখন এ বাসায় আসিয়া যখন সে জানিল যে, তাহার বিবাহ সুনিশ্চিত, তখন হইতে তাহার মনটা যেন কেমন একটু দমিয়া গিয়াছিল। কি একটা অপ্রকাশ্য অজ্ঞাত আশঙ্কা যে তাহার বুকখানি ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল

না। হঠাৎ অরুণোদয়ে প্রথম আলোকপাতের ন্যায় আজ তাহার প্রথম মনে হইল, সে কত অপবিত্র। বেশ্যার কন্যা, আজন্ম বেশ্যালয়ে লালিত ও পালিত—তাহাকে লইয়া এ কী প্রহসন অভিনয় হইতে চলিয়াছে!

তাহার মনটা ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। সে যদি এমন না হইত? তবে তাহার বিবাহ তো সত্যই হইত! বিবাহের নামে এত ছলনা, এত ষড়যন্ত্র, এত লুকোলুকি তবে ত' করিতে হইত না! কেন সে এমন হইল? আত্মগ্লানিতে তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার তো কোনও দোষ নাই! সে তো এখনও এমন কোনও অন্যায় কাজ করে নাই, যাহাতে সে কুলনারী অপেক্ষা কম পবিত্র? তাহার হৃদয়ে তো কাহারও এখনও স্থান নাই। তবে সে অপবিত্র কিসে? শুধু কি এই মাতা ভগিনীর সহবাসেই সে অপবিত্র? এ কী! এদের কাছে না থাকিয়া সে কোথায় থাকিতে পারিত? মানুষ মাতৃগর্ভেই জন্মিয়া থাকে। সে-ও তাই জন্মিয়াছে। তাহার মাতা তাহাকে প্রসব করিয়াছে স্বাভাবিকভাবে। তাহার জন্মদাতা কে, এবং তাঁহার সহিত তাহার জননীর সামাজিক বিধানে বিবাহ হইয়াছিল কি না—সে তাহা জানে না। কোনও সন্তানই তো না জন্মিয়া তাহা জানিতে পারে না। সেও জন্মিয়া তবে জানিয়াছে। তবে তাহার অপরাধ কী? ইহাতে যদি কোনও অপরাধ থাকে, তবে সে তাহার বাপ-মায়ের, তাহার নহে। অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে—তাহার জীবন মরণ ও সর্ব্বস্ব দিয়া? একি অদ্ভুত নিয়ম? —কী ঘৃণিত এই জীবন, কী দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা এই জাতির কপালে লেপিত? সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার নিজের মা ও দিদির উপর সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দিয়া

অতর্কিতে বড় বড় ফোঁটায় টশ টশ করিয়া কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু পড়িয়া তাহার বক্ষবসন সিক্ত করিয়া দিল।

মাঘ মাস। খুব শীত। বেলা ৩টার সময় নীলমণি ঘোষাল মহাশয়কে লইয়া বটুক আচার্য্য কুসুমের নূতন বাড়ীতে আগমন করিল। সঙ্গে কেবল একজন পুরোহিত।

নীলমণি বাবুর বয়স প্রায় ৫০।৫২—শরীর দোহারা, রং ময়লা, মাথায় টাক—কিন্তু শরীর এমন স্বাস্থ্যপূর্ণ যে তাঁহাকে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় তাঁহার বয়স ৪৫।৪৬ বৎসর। দাঁতগুলি সব বাঁধান, চোখে সোনার কাটা-চশমা। দুই হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলে দুইটি দামী আংটি!

পোষাক সাদা-সিধা। তাহাতে কোনরূপ বিলাসিতার লক্ষণ ছিল না। দাড়ি গোঁফ কামানো। গায়ে একটা ফ্ল্যানেলের শার্ট, তদুপরি একখানি দামী কাশ্মীরী দোরাখা শাল!

আজ এক বৎসর হইল, নীলমণিবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। সে পক্ষের কেবল একটি কন্যা আছে—সেও বিবাহিতা। জামাতা কলিকাতায় পোর্ট কমিশনারের অফিসে চাকরী করে।

সংসারে আর কেউ নাই, কাজেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইতেছে।

একটী পুত্রের জন্য তিনি লালায়িত—নহিলে যে বংশলোপ হয়! নিজে একজন ধনী, এখনও তাঁহার উপার্জ্জন যথেষ্ট—তিনি হাইকোর্টের উকীল। গৃহে একটি শিব-মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্পত্তি ও দেবসেবা বংশ ভিন্ন কি করিয়া রক্ষা হয়?

নীলমণি আসিয়া বসিতেই, বটুক "কনের ঘরের পিসির" মত তাড়াতাড়ি ছড়ি জুতা ও গায়ের কাপড়খানি ছাড়িয়া "কৈ গো" বলিয়া

অন্দরে প্রবেশ করিল। নীলমণি নীরবে আকাশের বর্ণ ও দৃশ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সহযাত্রী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ করিয়া হাঁচিতে হাঁচিতে নস্যে মনোনিবেশ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আটপৌরে একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া, আনিতম্ব বিলম্বী-ঘনকৃষ্ণ-কেশকলাপ এলাইয়া, ব্রীড়াবনতা আঙুরবালা গৃহে প্রবেশ করিয়া, উভয়কে প্রণাম করিয়া নীরব নতবদনে বসিল। কন্যার হাতে রুলী, কানে বেলকুঁড়ি, নাকে নোলক, ও গলায় একগাছি সুতাহার, পিছনে বটুক।

পাশের ঘরে কুসুম বেদানা ও দাসীর চাপা অথচ ঘন-ঘন সর্-সর্ খশ্-মশ্ ফিশ্-ফাশ্ ও দুপ্-দাপ্ শব্দ উঠিতেছিল। সমস্ত বাড়ীখানি একটা আসন্ন শুভ উৎসবের প্রতীক্ষায় যেন নিরুদ্ধশ্বাস, নীরব ও পবিত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে বটুক ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"কেমন ভট্চায, মেয়ে কেমন দেখচ'? বাবুর যুগ্যি কি না?"

ভট্টাচার্য্য অনুমোদনসূচক শিরঃসঞ্চালন করিয়া কহিল—"কন্যা সুন্দরী বয়স্থা, ও স্বাস্থ্যসম্পন্না তাতে আর সন্দেহ কি! আমরা এইরূপ পাত্রীই তো অনুসন্ধান কর্‌ছিলাম—এখন বাবুর মতামতের উপরই সব নির্ভর করচে। দেখি মা, তোমার বাঁ হাতখানি!"

আঙুর বাম হাতখানি ধীরে ধীরে বাড়াইয়া দিল। ভট্টাচার্য্য নাকে চশ্‌মা তুলিয়া, কর-সামুদ্রিক গণনা করিয়া বলিলেন—

"ধর্ম্মপ্রাণা সতী সাধ্বী পতিসেবা-পরায়ণা
পুত্রোৎপাদিকা কন্যা কল্যাণী চ সুলক্ষণা।

তোমার নাম কি মা?"

আঙুর বলিল—শ্রীমতী আমোদিনী—দাঃ—দেবী।"

বটুক আত্মপ্রসন্ন ভাবে মাথা দুলাইতেছিল, তাহার মুখে ও চোখে একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ আঙুরের কথায় বটুক চমকিয়া উঠিল, কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। আঙুরের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে ব্যাকুল হইয়া মন্ত্রচালিতের ন্যায় একবার বটুকের দিকে চাহিয়াই আবার পূর্ব্বের মত নতদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল।

নীলমণি কন্যার গঠন, বর্ণ, স্বাস্থ্য, রূপ সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিলেন। ভট্টাচার্য্যের গণনাফলে মনে মনে অপরিমিত আনন্দ লাভ করিয়া, বলিলেন—"ঘটক এইবার এঁকে নিয়ে যাও।"

পুনরায় প্রণাম করিয়া আঙুর আস্তে আস্তে নতবদনে বটুকের পিছন পিছন চলিয়া গেল। নীলমণি তদ্গতচিত্তে একদৃষ্টে ভাবী বধূর গৃহ-নির্গমন দেখিতেছিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক টিপ্ নস্য টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এঁদের পরিচয়?"

একটা দারুণ দুঃখের স্মৃতিতে মানুষের চক্ষু যেমন ছল ছল করিয়া উঠে, একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ও তাহার মুখটি যেমন অকস্মাৎ মলিন হইয়া যায়—বটুক তেমনি মুখভাব করিয়া কহিতে লাগিল—"মেয়ের বাপের নাম নিতাইসুন্দর রায়। তিনি পশ্চিমে রেলে কাজ করতেন, সেইখানেই দুইটি মেয়ে ও স্ত্রীকে রেখে মারা যান। সে আজ দশ বৎসর হল। বড় মেয়েটির বিবাহ হয়েচে—কুলীনেই কাজ হয়েচে। কিন্তু বিধবার এমনি দুর্ভাগ্য যে সে জামাইটি আজ চার বৎসর হল নিরুদ্দেশ।"

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন—কেন—নিরুদ্দেশ কেন ?"

বটুক কহিল—"ছেলেবেলা থেকেই তার সাধু-সন্ন্যাসীতে খুব ভক্তি সংসারে তার টান কোনও দিনই ছিল না। সেও রেলে কাজ করতো—হঠাৎ একদিন তার স্ত্রীকে তার মায়ের কাছে রেখে—সে যে কোথ উধাও হলো কেউ তার আজ পর্য্যন্ত কোনো সন্ধান করতে পারলে না।"

ভট্টাচার্য্য দুঃখিত ভাবে ঘাড় নাড়িলেন। পাশের ঘরে অস্ফুট ক্রন্দ ধ্বনি শুনা গেল। তাহার বিনানী ভাষাও যে অতিথিদ্বয়ের কাণে ন গেল, তাহাও নয়।

বটুক কহিল—"যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে, বিধবা বড় মেয়েটার কুলীনে কাজ করেছিলেন, কিন্তু ছোটর বেলায় আর পারলেন না, দেনায় বড় জড়িয়ে পড়েচেন। এখন এঁদের দিন চলা ভার। কোনো রকমে মেয়েটাকে সৎপাত্রস্থ করে' জাতরক্ষা করা' মাত্র। এঁদের বাড়ী হচ্ছে মুরশিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের কাছে আমিরগঞ্জে। সেখানে এই মেয়ের এক কাকা আছে, পাছে কিছু ভাগ দিতে হয়, এই জন্যে সে তো এদিকে বাড়ীই ঢুকতে দেয় না। এমনি পাষণ্ড সে। তার কথা আর কী বলব—ভট্চায মশায়—"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। বটুক থামিল। কহিল—"এখন এঁরা থাকতেন সেই পশ্চিমেই, মুঙ্গের জেলায় জামালপুরে। বাবু টাকা দিলেন, তবে এরা এখানে আসতে পারলেন্। এখন এ বিয়েটা যদি হয়। বাবু, এই গরীব অনাথা মেয়েটাকে যদি চরণে রাখেন, তবে এ বিধবাও উদ্ধার পায়, আপনারও অশেষ পুণ্য হয়।"

ভট্টাচার্য্য তৎপরে, গাঁই, গোত্র, পুরুষ, সন্তান ও কৌলিক সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্ন করিলেন। বটুক মেয়েদের ঘরে গিয়া কন্যার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা কহিয়া, যথাযথ উত্তর দিল। ভট্টাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া মত দিলেন যে, এ বিবাহ হইতে পারে।

তখনি পাঁচখানি মোহর দিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। চারিদিন পরেই বিবাহের দিনস্থিরও হইল।

মেয়েদের ঘরে একটা সুস্পষ্ট আনন্দগুঞ্জন ধ্বনিয়া উঠিল।

অস্তমান সূর্য্যের শেষরশ্মিগুলি গৃহাঙ্গনে পড়িয়া, সমস্ত গৃহখানিতে একটা ভাবী উৎসবের সূচনা করিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শুভদিনে শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বহুমূল্য পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া নীলমণিবাবু নববধূকে লইয়া বাড়ী ঢুকিতেই, তাঁহার কন্যা শান্তিলতা, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া, লাফাইয়া, ঘরে খিল দিয়া, চেঁচাইয়া, তুমুল অশান্তি ঘোষণা করিয়া দিল।

নীলমণিবাবু বিব্রত ও নববধূর কাছে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। নববধূ ভাবিল—"একি? এ কিছু জানতে পেরেচে না কি?"

নীলমণিবাবু কন্যাকে শান্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তাহাতে কন্যার পিতার উপর ক্রোধ ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিল; শেষে শান্তিলতা সারাদিন অনাহারে থাকিয়া সন্ধ্যায় গাড়ী ডাকাইয়া পিতার উপর রাগ করিয়া স্বামীগৃহে চলিয়া গেল। নীলমণি নিস্তার পাইল, আঙুরও হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মস্ত বাড়ী। চাকর চাকরাণী পাচক বেয়ারা অনেক। বাড়ীর মধ্যেই শিবমন্দির—নিত্য ষোড়শোপচারে শিবের পূজা হয়। সুন্দর সুসজ্জিত অগণ্য বিলাসোপকরণবহুল কক্ষাদি দেখিয়া আঙুরের অন্তর বিপুল আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—এ সব তাহারই!

আঙুর ভাবিল—এই গৃহ! কুলবতীর এখানে স্থান! জীবনে এমন স্বাচ্ছন্দ্য, এত নির্ভর, এত নির্ভয়, সে ত' আর কখনও অনুভব

করে নাই! মুহুর্মুহু সে আনন্দে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এ যে বড় সুখ, বড় আনন্দ!

কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই, নীলমণি একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলেন, সে আমোদিনীকে দিনভোর লেখাপড়া ও শিল্পকার্য্য শিখাইতে লাগিল এবং তাহার কাছে থাকিত। আঙুর প্রচণ্ড উৎসাহে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিল।

তাহার মনে হইতে লাগিল—এই সুখের আনন্দে তাহার মাথাটা ফাটিয়া কখন বুঝি চৌচির হইয়া যাইবে। এ কি কল্পনা করা যায়? এত সুখ সে স্বপ্নেও ভাবে নাই?…ঐ কুশ্রী বৃদ্ধ!…না, না, উনি বড় ভাল লোক! আমায় ছাড়া জানেন না, সদাই ওঁর চিন্তা—কিসে আমি সুখী হই! আহা—বড় মায়া হয়। কেউ নাই—ওঁর! বড় ভাল লাগে ওঁকে! ওঁর কথায় চোখে জল আসে—হলেই বা বুড়ো? আর বুড়োই বা কোথায়? একটু বয়স বেশী হয়েচে, এই তো? তা এমন সব দোজ্‌ব'রেদেরই হয়! মুখটি বেশ,—রংটা একটু ময়লা! হলেই বা! ……রং নিয়ে কি ধুয়ে খাব? এ কি বিলাত, যে সবারই রং ফর্সা হবে? আর ময়লাই বা এমন কী? উনি ঠিক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যাকে বলে। মুখটি বেশ—নাক কাণ চোখ বড় সুন্দর! দেখতে বড় ভাল লাগে।…কৈ কুশ্রী ত' নয়! তবে বোকা, তাই খুব ঠকানো গেছে।…হাঁ বোকা? মস্ত উকীল—বি-এ পাশ—বোকা কোথা? বিয়ে-পাগলা—আঙুরের অধরে হঠাৎ একটা প্রসন্ন করুণ ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে তাহা জানিতেও পারিল না।

বেলা দ্বিপ্রহর। আষাঢ় মাস! অত্যন্ত গরম। হঠাৎ কুসুম

কন্তার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। চাকরবাকরেরা সব নিজ নিজ কক্ষে তখন বিশ্রাম করিতেছিল। কুসুম বরাবর একেবারে দ্বিতলে আসিতেই দেখিল, মধ্যকার সুপ্রশস্ত সাহেবী ফ্যাশানে সুসজ্জিত কক্ষে, একখানি সোফায় বসিয়া শিক্ষয়িত্রী ও তাহার কন্যা গল্প করিতেছে। আঙুর কার্পেটে উল দিয়া জুতা বুনিতেছিল ও শিক্ষয়িত্রী হাতের বই আঙুল মুড়িয়া বন্ধ করিয়া কি বলিতেছিলেন।

কুসুমকে দেখিয়া আঙুরের হাস্য-প্রফুল্ল উজ্জ্বল মুখখানি অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠস্বর বসিয়া গেল। কণ্ঠ-তালু শুষ্ক হইয়া উঠিল।

কুসুম কন্যাকে দেখিয়া বলিল—"এই যে মা লক্ষ্মী এখানে! তোমার মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন দেখে আস্‌তে যে তুমি কেমন আছ। তিনি—"

শিক্ষয়িত্রী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বুঝি, তাঁদের বাড়ীর ঝি?"

কুসুম বলিল—"হাঁ—"

শিক্ষয়িত্রী—"তা বেশ, বস', এঁর সঙ্গে আলাপ কর'। আমি আসি।" বলিয়া মহিলাটি বাহির হইয়া গেল।

আঙুরের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। সে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। কহিল—"তুই এমন করে' এ বাড়ীতে যখন তখন আসিস না। কোন্ দিন সব কথা ফাঁশ হয়ে যাবে। তখন তোর আর আমার দু'জনেরই গর্দ্দানা যাবে। তা আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু।"

মা কহিল—"তা তো বুঝ্‌লুম্। তার জন্যেই তো আর আসি না।

সেই বিয়ের পর একদিন এসেছিলুম—আর আজ এসেচি। প্রায় এক বছর হল বিয়ে হয়েচে, ক'দিন এইচি, বল্?"

আঙুরের বুক ধড়ফড়্ করিতেছিল—বলিল,—"তা বেশ, কি বল্‌বি বল্ তাড়াতাড়ি। কোনও কথা আছে?"

কুসুম কন্যার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল—"হাঁ, একটু বিপদ হয়েচে।"

আঙুর জিজ্ঞাসা করিল—"বিপদ আবার কিসের?"

মা বসিল। মাতার বিপদ, অথচ কন্যার হৃদয় স্পর্শ করিল না, কেবল মাত্র শুষ্ক একটা প্রশ্ন করিল—"বিপদ কিসের?" এ মেয়েটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। নহিলে যে মাতা তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া এড় বড়টা করিয়াছে, যে তাহাকে এই সৌভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—তাহাকেই অবহেলা উপেক্ষা আর তাচ্ছিল্য? এ যে হিতে বিপরীত হইল! কুসুমের বড় কষ্ট হইল। বলিল—

"বেদানার বসন্ত হওয়ার পর থেকে, বদ্রীরাম তো ছেড়েই গিয়েছে, অন্য কেউও আর আসে না। আজ ৪।৫ মাস কাল কেবল ঘরের টাকা ভেঙ্গেই খেতে হচ্ছে। এমন করে আর কদ্দিনই বা যাবে? একটা মোটা আয় ছিল—কি কুক্ষণে মেয়েটাকে মায়ের দয়া হল—সমস্ত শরীরটা একেবারে শিলকোটা করে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে গেল। এদিকে হুকুমীচাঁদ আবার মধ্যে মধ্যে এসে সেই টাকার জন্যে তম্বি করে। নানান্ ভিচিকিচিতে বড্ড জের্‌বার হ'য়ে পড়েচি, মা। তাই ভাবচি, এ বাড়ীখানা ভাড়া দিয়ে, অন্য কোথাও গিয়ে বাস কর্‌ব ছোট একখানা ঘর নিয়ে।"

আঙুর উদাস নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু শুনিল, একটা 'আহা' 'উহু' কিছুই বলিল না!

কুসুম কিয়ৎক্ষণ কন্যার মুখে কিছু সহানুভূতির জন্য, একটা উত্তরের জন্য, কোনও সাহায্যের জন্য চাহিয়া রহিল; কিন্তু কন্যার কোনও ভাবান্তরই সে দেখিল না, তাই স্পষ্ট করিয়া বলিল—

"এখন কিছু টাকা কড়ি দে। এই ত এক বছর হল', কিছুই তো দিলি না!"

আঙুর কহিল—"আমার কাছে তো টাকা থাকে না যে আমি তোমায় দেব।"

মা বলিল—"আদায় করে নে। এটা সেটা বলে আদায় কর্‌বি—তোর নিজের কাছে সিন্দুকের চাবি রাখ্‌বি, তবে তো!"

কন্যা কহিল—"আমি যা চাই, তখুনি তাই পাই। যা' না চাই, তা-ও পাই। চাবি নিয়ে তখন অকারণ বোঝা বয়ে বেড়িয়ে লাভ?"

মা দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল—"চাবি নিয়ে লাভ? আ মর্‌ আজুলী। বড় সতী হয়েচেন। বিয়ের আগে পই পই করে শিখিয়ে দিলুম, কি করে টাকা আদায় কর্‌তে হবে, আর কেনই বা তোর বিয়ে দিচ্ছি। তোর যে বিয়ে দিলুম, তোকে গেরস্ত করে দিয়ে, আমি পথে বস্‌বো বলে নাকি? না, তা' নয়—টাকার জন্যে লো—টাকার জন্যে! এতদিন কিছু ভাবি নাই—বেদানা আমার রাজরাণী ছিল। আজ ভগবান তাকে মেরেচেন বলেই ত এত দুঃখু।" বলিতে বলিতে জননী নেত্রমার্জ্জনা করিল।

আঙুর কহিল—"দেখ' মা, আজন্ম তোমাদের এই সব ঢং দেখেই

মানুষ হয়েচি—সুতরাং ও সব আমি খুব ভালই জানি। তোমাকে আমি সোজা কথা বলে দিচ্ছি—এ বাড়ীতে তুমি আর এসো না, আমার কাছে কিছু প্রত্যাশাও করো না। যদি আমার কথা না শোন', তবে শেষে অপমান হবে, কষ্ট পাবে।"

মাতার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে যে এ কথার পর আর কী বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে কন্যার মুখে রাক্ষসীর মত একদৃষ্টে রোষকষায়িত লোচনে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে যদি ইহার সমস্ত তেজ, এই সতীপণা, এই দুর্বিসহ অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতাম! পদাঘাতে অই দন্তপংক্তি যদি নিপাতিত করিতে পারিতাম! নিস্ফল ক্রোধে মাতার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

আঙুর চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া, দুইখানি একশত টাকার নোট আনিয়া, যেখানে কুসুম বসিয়াছিল, সেইখানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—"এই নাও, এইবার চলে যাও। আর কখ্খনো এ মুখো হয়োনা। ওঠ—ওঠ"—বলিয়াই কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

কুসুম কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া, নোট দুইখানি কুড়াইয়া লইয়া পেটকোঁচড়ে বাঁধিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আঙুর উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষায় মোটামুটি ইংরাজী ও বাঙ্গলা শিখিয়াছে, শেলাইয়ের কাজও খুব ভালই করিতে পারে; এতদ্ভিন্ন পাকপ্রণালীতে সে একজন ওস্তাদ রাঁধুনী হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে স্বামীপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ একটি পুত্র ও একটি কন্যাও নীলমণি বাবুকে উপঢৌকন দিয়াছে। নীলমণিবাবু হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন।

সংসারে গুণবতী মনোমত সুন্দরী স্ত্রী, কার্ত্তিকেয় তুল্য রূপবান পুত্র, বিপুল অর্থ, বিশাল অট্টালিকা ও বিলাসোপকরণ মোটরকার, ইলেকট্রিক পাখা ও আলো, দাস দাসী, নীলমণি বাবুর কিছুরই অভাব ছিল না। নবোদ্যমে দ্বিগুণ বলে নূতন উৎসাহে নীলমণিবাবু আবার সংসার আরম্ভ করিয়াছেন। এই সুখ ভোগ করিবার জন্য ভগবান্ যেন তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন—শিবদ্বারে মাথা নত করিয়া নীলমণিবাবু বারম্বার এই প্রার্থনাই করিতেন।

বাল্যস্মৃতি আঙুরের কাছে এখন শত বৃশ্চিকদংশনের মত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। এত চেষ্টা করিয়াও সে তাহার অতীতকে ভুলিতে পারিতেছে না! আর সর্ব্বাপেক্ষা তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া রাখিয়াছে—তাহার মিথ্যা পরিচয়! সময় সময় তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠে। স্বামীর সুগভীর প্রেমসমুদ্রে সে যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া একটি বিন্দুর মত

সীমা হারাইয়া, মিলাইয়া যায়, তখন তাহার মনে পড়ে—এ সুখ যে তাহার প্রতারণার ফল! নিজের উপর অসহ্য রাগ ও ঘৃণা হয়; মন তিক্ত হইয়া উঠে, জীবন দুর্ব্বহ হয়, চক্ষু দিয়া অবাধ অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। খুব শক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করে সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, যাহা হয়, হোক্। এ ছলনার জ্বালা অসহ্য। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইবে সেও ভালো। এ বাড়ীতে দাসী হইয়া থাকিবে—তবু এত প্রাণ ও প্রীতির আড়ালে এ প্রকাণ্ড দৈত্যটাকে আর লুকাইয়া রাখিবে না।··· ঠিক ঠাক্ করে, কিন্তু আসল সময়ে মুখ দিয়া কথা ফোটে না—কে যেন সবলে তাহার মুখ চাপিয়া ধরে। এত সুখেও এক গোপন বেদনায় তাহার অন্তরখানি গুমরিয়া মরে। যন্ত্রণায় মাথা ঝিম ঝিম করে, নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আসে। বলিতে পারিলে যেন সে বাঁচে! এ কী! মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা!

প্রাতে ও সন্ধ্যায় আঙুর যখন স্বামীর পদতলে লুটাইয়া গলবস্ত্র হইয়া নিত্য প্রণাম করে, তখন সে প্রাণের সকল তন্ত্রী দিয়া অতি ব্যাকুল হইয়া নিবেদন করে—"হে আমার ইহপরকালের দেবতা, হে আমার শাপনাশন প্রভু, আমার ছলনার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। আমাকে বল দাও, আমি যেন নিঃশঙ্কচিত্তে একবার সেই গোপন কথাটি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি?"

শিবমন্দিরে দুই বেলা প্রণাম করিয়াও আঙুর কেবল এই প্রার্থনাই করে—"হে শঙ্কর, আমায় সত্য কথা বল্‌তে বল দাও। আর যেন আমার স্বামীকে আমি অন্ধকারে না রাখি। আমার পরিচয় প্রকাশ করিয়া দাও। আমার পরমায়ু দিয়া আমার স্বামীর আয়ু বর্দ্ধিত কর।"

তাহার আদর প্রতিষ্ঠা ও আসন যতই দৃঢ় হয়, ততই আঙুরের ব্যথাও বাড়িতে থাকে। আঙুর উন্মাদের মত হইয়া উঠিল। সে এ কথা প্রকাশ না করিলে সত্যই যেন সে পাগল হইয়া যাইবে।

বেলা প্রায় পাঁচটা। নীলমণি বাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, অন্যান্য দিনের মত তাঁহার পোষাক-ঘরে প্রতীক্ষিতা আমোদিনী নাই। এমন তো কখনও হয় নাই। কী হইল? কোনও অসুখ হইয়াছে নাকি। নীলমণি খট্-খট্ করিয়া বাহিরে আসিতেই, আমোদিনীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনও অসুখ টসুখ হয়নি তো!" বলিয়া কপালে হাত দিয়া দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন।

আঙুর বলিল—"নাঃ—অসুখ কেন হবে? আমার আজ একটু দেরী হয়ে গেছে। পড়ার ঘরে একখানা বই পড়্তে পড়্তে টেবিলের উপর ঢুলে পড়েছিলাম।"

"ওঃ এই কথা?" নীলমণিবাবু আশ্বস্ত হইলেন।

জলযোগাদির পর নীলমণি যথানিয়ম বসিবার ঘরে গেলেন। রাত্রি ৮টায় পুনরায় উপরে আসিলেন।

আহারাদির পর পুত্রকন্যাকে যথাস্থানে শয়ন করাইয়া, আঙুর তাহার নিত্য অভ্যাস মত স্বামীর পদসেবা করিতে বসিয়া, হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলমণি ভীত চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া, আঙুরকে বক্ষমধ্যে টানিয়া লইয়া, সাদরে চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন—"ওকি, ওকি, কী হল? কাঁদচ কেন?"

আঙুর ফোঁপাইতে লাগিল, নিরুত্তর! আজ সে বলিবেই, কারণ

এ অসহ্য যন্ত্রণা সে আর সহিতে পারে না। যাহাকে ভালবাসা যায়, যে ভালবাসে—তাহার সঙ্গে কখনও কি ছলনা চলে? এ যে অসম্ভব, এ যে অস্বাভাবিক! সে যে এখন স্বামীর স্ত্রী, পুত্রের মাতা, গৃহের কর্ত্রী। কিন্তু মুখে কথা আসে কৈ? তাহাকে স্বামী পরিত্যাগ করিবেন, এ তাহার তত কষ্ট নয়—স্বামীর এই সুখ-স্বর্গ যে সে মহাপাতকী ভাঙিয়া দিবে—ইহাই তাহার একমাত্র ভয়। হয়ত তিনি এত বড় একটা বেদনা সহ্য করিতেই পারিবেন না। তাহা হইলে তাহার এ পাতকের আর যে অন্ত থাকিবে না! তবু বলিতে হইবে।

নীলমণিবাবু কাতরভাবে বারম্বার ঐ একই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আঙুর কহিল—"ওগো সেই কথাই যে আজ বল্‌ব, মুখে আসচে কৈ?" আবার উচ্ছসিত বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

নীলমণি অধিকতর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কী বল্‌বে? শীগ্‌গীর বল; আমার বুক বড় ধড়্ ফড়্ কর্‌চে, আমোদ।" কণ্ঠস্বর আর্ত্ত।

হাতের গোড়ায় বিদ্যুৎ-আলোর সুইচ ছিল, আঙুর টিপিয়া দিয়া কক্ষটি অন্ধকার করিয়া দিল। বলিল—"কী করে' এতদিন পরে তোমায় সে কথা বলব' গো? কী করে এ পূজা নষ্ট করি? আমার নিজের হাতে গড়া এ দেব-মন্দির আমি কী করে' ভাঙি?"

আঙুরকে বক্ষোমধ্যে সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নীলমণি কহিলেন—"যাই হোক্, শীগ্‌গীর বলে ফেল! আর দেরী সহ্য করতে পারচি না। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

আঙুর বলিল—"আমি গৃহস্থের কন্যা নই—আমি বেশ্যাকন্যা! আমার মা ও ভগিনী এই কলকাতাতেই—আমি সেই তাদেরি কন্যা নামহীনা গোত্রহীনা— ।" আঙুরের হৃদয়ের পাষাণ ভার অপসারিত হইল। একটা বিরাট মুক্তি, একটা অসীম আনন্দ, একটা গভীর প্রসন্নতায়—তাহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া উঠিল। শিথিল হইয়া সংজ্ঞা হারাইয়া আঙুরের দেহখানি নীলমণির বুকে আস্তে আস্তে এলাইয়া পড়িল।

নীলমণির শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—তাঁহার মাথার মধ্যে কথা কয়টি এমন একটা ঘূর্ণা সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে, তিনি জীবিত কি মৃত, নিদ্রিত কি স্বপ্ন দেখিতেছেন, প্রফুল্ল কি বিষণ্ণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মাথা হইতে একটা কুণ্ডলীকৃত ধূমস্তম্ভ হঠাৎ বাহির হইয়া যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল। তিনি আরো শক্ত করিয়া আঙুরকে জড়াইয়া ধরিলেন।

নীরব, নির্ব্বাক্! গৃহ অন্ধকার!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইল। নীলমণিবাবুর চক্ষু বসিয়া গিয়া, জবাফুলের মত লাল টক্‌টক্‌ করিতেছে। আঙুরের চক্ষু দুইটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

কর্ত্তা গিন্নীর মুখ চোখ দেখিয়া চাকর বাকরেরা পর্য্যন্ত আঁচ করিয়া ফেলিল একটা গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটিয়াছে।

উভয়েই নীরবে গম্ভীর মুখে নিজ নিজ কার্য্য করিতে লাগিলেন। নীলমণি সে দিন কাছাড়ী গেলেন না।

দ্বিপ্রহরে আঙুরকে ঘরে ডাকিয়া নীলমণি জিজ্ঞাসা করিলেন— "আচ্ছা, এতদিন তুমি আমায় এ কথা বল' নাই কেন?"

আঙুর নির্ভয়ে বলিল—"ভয়ে।"

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল—"আজ বল্‌লে কেন?"

আঙুর বলিল—"স্বামী কী বস্তু যখন চিনি নাই, তখন তোমার চোখে ধূলো দিয়ে তোমার সর্ব্বস্ব নিয়ে আমার মা-বোনের কাছে ফিরে যাব, এই পরামর্শ করেই এসেছিলাম, কাজেই সেই মতলবেই ছিলাম। তারপর, স্বামীর প্রীতি আমার মত মহাপাপীকেও চিনিয়ে দিল গৃহ কি, স্বামী কি! প্রেম আর সতীত্বের মর্য্যাদা যে অতিবড় পাতকীকেও কুপথ হ'তে সুপথে আন্‌তে পারে, আজন্মের সংস্কার কাটিয়ে অন্ধকার হ'তে আলোয় আন্‌তে পারে, এই সব যখন

প্রাণে প্রাণে বুঝলাম, তখন হ'তে আমার প্রাণে কাঁটার মত কেবলি খচ্ খচ্ করছিল যে কী করে' এই ছলনা প্রকাশ করে শান্তি পাই। এর জন্যে আমি আজ চার বৎসর কাল কী কষ্টে যে আছি—আর আছি কেন, ছিলাম—তা' এক অন্তর্য্যামীই জানেন। কাল থেকে আমার আর কোনও দুঃখ নেই, আমার বুকে এতদিন যে পাহাড় চেপে বসেছিল, সে পাহাড় কাল সরিয়ে ফেলেচি। আমি ভালবাসা পেয়েচি—ভালবেসেচি। আর কি ছল-চাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনা থাকতে পারে?"

কঠোর স্বরে নীলমণি বলিলেন—"এর ফল কি হবে জান?"

স্থির অবিকম্পিত দীপশিখার ন্যায় আঙুর কহিল—"জানি। আমায় ত্যাগ করবে। আমায় ঝাঁটা মারতে মারতে বিদেয় করে দেবে। আমি তোমার দাসী হবারও যোগ্য নই।"

"তাড়িয়ে তো দেবোই; তারপর তুমি কী করবে?"

দৃঢ়নিশ্চয়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে আঙুর বলিল—"তোমার কাছে যা' পেয়েচি, যা' শিখেচি, তার চেয়ে বড় আর পৃথিবীতে নাই। সুতরাং তোমার পদধূলি পাথেয় নিয়ে একেবারে মা গঙ্গার জলে আশ্রয় নেব। এই জীবনে যে নরক হ'তে স্বর্গে পর্য্যন্ত উঠেচে, তার আর কামনা কিসের? আমার সব সাধ মিটেচে, প্রভু।"

"তোমার খুঁটে কি?"

আঙুর উন্মাদের মত অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"ও মহাপ্রসাদ। তোমার থালা থেকে নিয়ে রেখেচি। শেষ মুহূর্ত্তে মুখে দেব। আমার সংসারের কল্যাণ—আমার জীবনপারের সম্বল"—বলিয়া সেটি মাথায় ঠেকাইল।

নীলমণি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দাস দাসীর কলরবে ভিতরে আসিয়া শুনিলেন, আঙুরের ফিট্ হইয়াছে।

তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া মুখে হাতে জল দিতে জ্ঞান হইল। দাস দাসীরা সরিয়া গেল।

আঙুর বলিল—"কেন আমার ঘুম ভাঙ্গালে?"

নীলমণির চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোটা তপ্ত অশ্রু নিপতিত হইল। কহিল—"আমোদ, তোমায় আমি পরীক্ষা কর্‌ছিলুম। তুমি নির্দ্দোষী—অন্যের পাপ তোমায় স্পর্শাবে কোন্ হিসাবে? তোমার মত পতিব্রতা গৃহস্থ ঘরেও দুর্ল্লভ। তুমি নিশ্চিন্ত হও—তুমি আমার যা ছিলে এখন হ'তে আমার কাছে তার চেয়েও প্রিয়তর হলে।"

আবার অট্টহাস্য! এবার আর থামে না। অসম্বদ্ধ ভাষায় আঙুর বলিল—"পতি দেবতার চেয়েও বড়, পায়ের ধুলা দাও, আমি যাই—গঙ্গার জল বড় ঠাণ্ডা! আমি মহাপাতকী—স্বামীর সঙ্গে ছল চাতুরী? তোর নরকেও ঠাঁই হবে না—হো হো হো হো—"

নীলমণি ভীত হইয়া উঠিলেন। তখনি চিকিৎসক কবিরাজে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কবিরাজেরা বলিল—উন্মাদের লক্ষণ।

ডাক্তার বলিল—হার্ট ফেল্ কর্‌তে পারে।

নীলমণিবাবু শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

সত্যপীরের আবির্ভাব

সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরকাল একাদিক্রমে পুলিশের জমাদারী করিয়া অকস্মাৎ শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ তা', সংক্ষিপ্তসার হইয়া তা' মহাশয়, এক দিন সপরিবারে স্থাবর ও অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তিসহ নিজ গ্রাম বিজয় নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলঘরিয়া রেল ষ্টেশনের দুই তিন মাইলের মধ্যেই বিজয়নগর, যাহা কথ্য ভাষায় বিজ্‌ নাগ্‌রা নামে বিখ্যাত।

বিজ্‌ নাগ্‌রা একখানি ছোট গ্রাম। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, দুই চারি ঘর কায়স্থ—ও বেশীর ভাগ সদ্গোপের বাস। তা' মহাশয়েরা এখানে দুই পুরুষাবধি বসবাস করিতেছেন।

পুরাতন শ্যাওলা-পড়া, চুণ-বালি-খসা, একখানি জীর্ণ একতলা বাড়ী। ঘরের দেওয়ালে যেখানে সেখানে ফাট ধরিয়াছে, সেই সব ফাটলের মধ্যে অশ্বত্থ, বট, গোয়াল-ঘষে' এবং চিড়্‌-চিড়ে প্রভৃতি বিবিধ তরুগুল্ম, ম্যালেরিয়াশীর্ণ রোগীর শরীরে নানা জটিল ব্যাধির মত, সদর্পে আত্মপ্রকাশ করিয়া, সবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। সদর দরজা এবং প্রত্যেক ঘর এতদিন তালাবন্ধ ছিল, তা' মহাশয় আসিয়াই সমস্ত দুয়ার জানালা খুলিয়া দিলেন। ঘর হইতে একটা বদ্ধ গরম হাওয়া, একটা দুর্গন্ধ ও একপাল মশক দীর্ঘ নিদ্রার অবসানে গভীর বিরক্তি সহকারে আড়িমুড়ি ভাঙ্গিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। কতকগুলি আরশুলা, ইঁদুর ও ছুঁচা এদিক ওদিক

ছুটাছুটি করিয়া লুকাইল! তা' মহাশয় নাক সিঁটকাইয়া, নাকে মুখে কাপড় গুঁজিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বেলা প্রায় দশটা। মহিষমর্দ্দী হিন্দুস্থানী শকটচালক দুইজন প্রাপ্য ভাড়া পাইয়া বকশীষের জন্য পূর্ব্বের বাংলা ও পশ্চিমের হিন্দী ভাষায় অপূর্ব্ব সাম্য ঘটাইয়া, বিবিধ অঙ্গভঙ্গীতে শকটচালনে তাঁহার জন্য যে কী প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছে তাহা জানাইয়া পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু যখন কোনও সুফল ফলিল না, তখন বিরূপাস্য হইয়া তাবৎ বঙ্গদেশীয় নরনারীর উদ্দেশ্যে অপ্রিয় অসাধুবাদ করিতে করিতে আম-বাগানের মধ্য দিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল।

গ্রামের সকলেই জানিত, এটি তা' মহাশয়গণের বসতবাটী। কিন্তু উক্ত মহাশয়গণের একমাত্র বংশধর নলিনাক্ষকে কেহই বড় একটা চিনিত না—কারণ গ্রামে তিনি খুব কমই আসিতেন। এক বৎসর দেড় বৎসর অন্তর দুই তিন দিনের ছুটিতে আসিয়া, ঘরবাড়ী দেখিয়া—রামা চৌকিদারকে শাসাইয়া' বাড়ীঘরের হেফাজতের ভার তাহার উপর দিয়া, সেইদিন অথবা তৎপর দিনই চলিয়া যাইতেন। সম্প্রতি দুই তিন বৎসর গ্রামে তা' মহাশয়ের পদধূলি একেবারেই পড়ে নাই। গ্রামে স্বাস্থ্য বড় খারাপ, কেবল প্লীহা ও ম্যালেরিয়া; সমাজ নাই, সঙ্গ নাই, ভদ্রলোক নাই, সমস্ত জিনিষ পত্রাদি পাওয়া যায় না,—কাযেই থাকিতেও ইচ্ছা হইত না। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পুলিশের চাকুরী ছুটি নাই, দায়িত্বপূর্ণ কায, অধিক দিন অনুপস্থিত থাকা যায় না, কাযেই তা' মহাশয়ের সামান্য একটু ইচ্ছা থাকিলেও গ্রামবাসী অনুগতগণের অনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ঠেলিয়াও তাঁহাকে যাইতে হইত! কী করেন—পুলিশের চাকুরী, নিরুপায়।

গ্রামে তা' মহাশয়ের প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না। তাহার কার
তাঁহার সম্পদ নহে, পদ। গ্রামবাসী সকলেই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষি
সুতরাং তাহাদের প্রাণে বিভীষিকা সঞ্চার করা বিচক্ষণ তা' মহাশয়ে
মোটেই কষ্টকর হয় নাই। গ্রামবাসীরা জানিত, তা' মহাশয় কুষ্টিপু
থানার দারোগা; শুধু দারোগা বলিয়াই নহে—তিনি সাধারণ বি.এ
এম্-এ, পাশকরা কাণ্ডজ্ঞানহীন বিলাসী স্বেচ্ছাচারী সর্ব্বভুক ধনীপুত্র-
নূতন বাঙ্গালী দারোগা নহেন। তিনি আইন্ জানেন; কার্য্যে তিনি এ
পরিপক্কতা লাভ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে কাযের ঘূণ বলিলেও চলে
তাঁহার দাপে ব্যাঘ্র এবং গাভী একই ঘাটে সত্যসত্যই জলপান করে-
(অবশ্য রাত্রি এবং দিন ভেদে একাকী); তিনি নিজে তো উৎকোচ গ্র
করেনই না, যদি তাঁহার অধীনস্থ কাহারও নামে কেহ উক্ত পদার্থ গ্রহণে
কথা ঘুণাক্ষরেও তাঁহার গোচরে আনে, তবে তাহাকে তিনি তদ্দণ্ডে
কর্ম্মচ্যুত করিয়া থাকেন; উপরওয়ালা সাহেব মহলে সেইজন্য তাঁহ
বিশেষ নাম-ডাক। তিনি যাহা তদন্ত করেন, চিরদিনই তাহা অভ্রান্ত-
তিনি যে মোকদ্দমা চালান্ দেন তাহা হাকিমেরা শাজা দিয়াই থাকে
নচেৎ হাকিমেরই চাকুরী যায়। বন্গাঁয়ের হাকিমের নাকি ঐ ভ
চাকুরী গিয়াছে! সাহেব প্রায়ই তাঁহার থানায় নূতন বাঙ্গা
দারোগাগণকে পাঠাইয়া দেন—তা' মহাশয় সেই সব অর্ব্বাচীনদিগ
তালিম দিয়া, হাতে-কলমে কর্ম্ম শিক্ষা দান করেন।

এক কথায় তিনি গরীবের মা-বাপ; দুষ্টের দমন অ
শিষ্টের পালনই তাঁহার জীবনের মন্ত্র; ঘুঁষ তিনি জীবনে কখ
একপয়সাও গ্রহণ করেন নাই। পৌলিশ-চরিত্রসুলভ ঘুঁষ বা ঘুঁ

কোনওটিরই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এজন্য তাঁহাকে সকলেই অত্যন্ত ন্যায়বান্ এবং দয়ালু বলিয়া জানে। পাছে কেহ পান দিলে প্রত্যাখ্যান করিতে লজ্জা হয়, তাই তিনি পানই ত্যাগ করিয়াছেন। গ্রামে আসিয়াও সেই জন্য তিনি কোথাও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না—কারণ সেও ঘুষ, হয়ত' কোনও দিন এই এলাকাতেই তিনি সহর কোতোয়াল হইয়া আসিতে পারেন! এত তাঁহার সাবধানতা! এই সমস্ত কাহিনী নানা ভাবে নানা ভাষায় নানা ভাষ্যে তা' মহাশয় গ্রামিকগণকে জানাইয়া দেওয়ায়, তাহারা তা' মহাশয়কে উত্তোরোত্তর ভয় ও ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই জন্য গ্রামে আসিবামাত্রই তা' মহাশয় প্রবলবেগে ধর্ম্মে ও প্রচুর পরিমাণে কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অচলা নিষ্ঠা। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক, নিত্য শিবপূজা, দেবালয়ে প্রণামী, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা, ব্রত-বার-পার্ব্বণ সমস্ত যথাযথ পালন—তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া! পথে ব্রাহ্মণ দেখিলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম, ললাটে ফোঁটা, অঙ্গে নামাবলী, মুখে বিশেষতঃ লোকজন-সমক্ষে অবিরত হরিনাম, হস্তে হরিনামের মালা, কণ্ঠে তুলসীর মালা বাহুতে ও বক্ষে রুদ্রাক্ষের মালা ও শিরে শিখা ধারণ করিয়া, কায়মনোবাক্যে তা' মহাশয় পরম ধার্ম্মিক হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ ঈদৃশ ধর্ম্ম প্রবণতায় গৃহিণীর সহিত তা' মহাশয়ের সকল সময় বড় সাত্ত্বিকভাবে প্রেমালাপ হইত না। ক্রমশঃ দৈনন্দিন প্রণয়-বচন বচসায় এতদূর গড়াইতে লাগিল যে, গ্রামসুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকার ভীড় ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করা লোকের অসম্ভব হইয়া উঠিত। জনসমাগমে ও শত পরিচিত মুখ-দর্শনেও তা' মহাশয়ের ব্যবহারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিত না।

তা-গৃহিণী তীব্র উচ্চ কণ্ঠে বলিতেন—"আ' মর্ বেড়াল-তপস্বী! দেশে এসে সাধু সেজেচেন্! বের করে' দেব' আমি তোর সাধুগিরি,—বিট্‌লে, বজ্জাৎ জোচ্চোর—"।

তা'-মহাশয় সততই ধীর ও মৃদুকণ্ঠে সাধু ভাষায় সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন। তাঁহার এ সাধুভাষাতে মেছুনী, দোকানী, পশারী, ষ্টেশনের কুলি, ঘাটের মাঝি, চাষী, রাখাল কেহই কখনও বঞ্চিত হইত না; কিন্তু দাম্পত্য বচসার সময় সকলে তাঁহার কণ্ঠ ও ভাষার অসাধারণ পার্থক্য লক্ষ্য করিত। তিনি উত্তর দিতেন—"মনে থাকে যেন, হারামজাদী, বদমাইস্, গলা ধাক্কা দিয়ে, মুখে চুণ কালী দিয়ে, তোকে গাঁ থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে দেব'। বড় বা'ড় বেড়েচে তোর?" ইত্যাদি আরও কত কি?

তা' মহাশয়দের উক্ত প্রকার দাম্পত্য-বিশ্রম্ভালাপের বিশেষত্বটুকু ছিল শাস্ত্রীয় অর্থাৎ লঘু-ক্রিয়াসম্পন্ন এবং অনতিদীর্ঘ। লোক জন যেমন শীঘ্র জমিত, তেমনি শীঘ্র ভাঙিতও।

প্রথম প্রথম তা' মহাশয় তাঁহার অনুগতদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন—"দেখ,' দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ অতীব অনিষ্টকর এবং মনুষ্যত্ব হানিকর। কারণ দ্বিতীয়বার বিবাহিত বধূ চিরদিনই বড় মুখরা ও কলহ-পরতন্ত্রা হয়। তজ্জন্য স্বামীর কি ঐহিক কি পারত্রিক উভয়বিধ শান্তিই নষ্ট হয়। কিন্তু কী করিতে পারি, যখন বিবাহ করিয়াছি, তখন আর গত্যন্তর নাই। নারায়ণ হরি হে, সকলই তোমার লীলা—এইজন্য লোকে তোমায় লীলাময় বলে। কোথায় নিরাপদে তোমার নাম লইব না এ কী বিপদ?"

শ্রোতার দল প্রথম প্রথম যেরূপ উৎসাহের সহিত তা' মহাশয়কে অনুমোদন ও সমর্থন করিত, ইদানীং আর তাহা করিত না—কেবল নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে কেহ মাথা নাড়িত, কেহ বা কুণ্ঠিত ভাবে—হাঁ, তা—কি না' পর্য্যন্ত বলিত, কেহ বা বড় জোর সমর্থন-ব্যঞ্জক দন্তরুচি-কৌমুদী বিকশিত করিত, আর অধিকাংশই চুপচাপ করিয়া থাকিত। তা' মহাশয়, হাজার হউক পুলিশের লোক ত', বুঝিতে পারিতেন। শেষে কলত্রের সহিত কলহ এরূপ আকার ধারণ করিল যে, দিবারাত্রের মধ্যে অত্যল্প মাত্র কালই বাদ যাইত। কাযেই তা' মহাশয় কৈফিয়ৎ দেওয়াও আস্তে আস্তে বন্ধ করিলেন।

প্রথম প্রথম তা' মহাশয়ের গৃহে প্রতি একাদশীতেই সত্যনারায়ণের পূজা হইত, হরির্লুট হইত, মধ্যে মধ্যে বহির্ব্বাটীতে একখানি খোল ও করতাল যোগে অ-সুরতালে হরিনাম সংকীর্ত্তনও হইত—লোক জনও আসিত, বসিত, সত্যনারায়ণ-পূজার দিন শিন্নী প্রসাদ পাইত। তা' মহাশয় বলিতেন—"গত ১৮ বৎসর কাল, আমার আর কিছু হউক বা না হউক, একাদশীর দিন বাবা সত্যনারায়ণের পূজা আমার গৃহে বরাবর হইয়াছে, কোনও দিনের জন্যও বাদ পড়ে নাই—ইচ্ছা আছে, যতদিন এ পাপশরীর থাকিবে, ততদিন বাবার পূজা পৌঁছাইয়া দিবই।"

কিন্তু ৭।৮ মাস যাইতে না যাইতেই, উক্ত পাপশরীরে দেশীয় ম্যালেরিয়া ঢুকিতে না ঢুকিতেই বাবার পূজা বিরল হইয়া আসিল। পল্লীগ্রামের লোক চিরদিনই নিমন্ত্রণ-লোলুপ, কাযেই একাদশী আসিলেই ভাবে, গত একাদশীতে পূজা হয় নাই আজ হবেই, কিন্তু হয় না, একাদশীর সন্ধ্যা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। লোকের মন আরও চটিয়া যাইতে লাগিল।

তা' মহাশয়ের পিতা বিরূপাক্ষ তা' ছিলেন ঈ বি রেলওয়েতে এক টিকিট কলেক্টার, কাযেই জন্মাবধি নলিনাক্ষ বিদেশে। কখনও কচিৎ দেশে আসিতেন। সেইজন্য দেশের লোকে তাঁহাকেও ভাল জানিত না। সম্প্রতি তিনি দেশে বাস করিতে আসায় লোকের সেই সৌভাগ্য ঘটিয়াছে।

তা' মহাশয় গ্রামে রটনা করিয়াছিলেন, তিনি ছয় মাসের ছুটি লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ছয় মাস কাটিয়া গেল। পুকুরঘাটে সেদিন মাতঙ্গিনী তা-গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"দারোগাবাবু কি আরও ছুটি নিলেন নাকি, বৌ?"

বধূ সেদিন পতির সহিত কলহ করিয়া তাঁহার উপর নিতান্তই বিরূপ ছিল, বলিয়া ফেলিল—"ছুটি আবার কোথা? ওকে যে ডিসমিস্ করেচে সাহেব।" কাণাঘুষায় কথাটা সবাই শুনিল, কেহ কিছু বলিল না।

প্রথম প্রথম লোকে পূর্ব্ব অভ্যাস বশে ভাবিত "মিন্‌সে মিথ্যুক হলেও ধার্ম্মিক বটে, কিন্তু ওর ঐ বৌ ছুঁড়ীটা অতি পাজী। দ্বিতীয় পক্ষের কিনা? কী ঝগ্‌ড়াটে' বাপ্‌রে বাপ্।" কেহ বলিত—"না—না, বৌটাই ভাল, ওর মনে কোনও খল কপট নাই।"

আর একজন অমনি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে শুধু কি ঝগ্‌ড়াটে? দেখ' না, কী নির্লজ্জ—ছুঁড়ীর জ্বালায় ঘাটে পুকুরে যাবার জো নেই।"

সত্যনারায়ণের শিন্নী অপেক্ষাও কথোপকথনটি অধিকতর মুখরোচক হইয়া উঠিল। মাখন ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম, কি রকম?"

নফর কহিল—"কী রকম আর? লজ্জা সরম কাকে বলে একটু যদি

জানে। ঘাটে এমন করে গা খুলে গা হাত ধোয় যে, আমি ত' খুড়ো ও ঘাটে থাক্‌লে ওদিকই মাড়াই না।" নফরের, বয়স প্রায় ৩০।৩২ জাতিতে সদ্‌গোপ।

সকলেই নীরবে একটু চিন্তা করিল। মাধব এ সভায় বয়োজ্যষ্ঠ। তিনি কহিলেন—"আচ্ছা ওর প্রথম পক্ষের স্ত্রী কত দিন মারা গেছে ?"

নিতাই কহিল—"ও তো বলে, ৮ বছর।"

মাধব গম্ভীরভাবে "হুঁ" বলিয়া চুপ করিতে, সকলেই উৎসুক দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিল।

শেষে বহু সাধু অসাধু এবং ন্যায়ও অন্যায় ভাষায় এবং তর্কে সিদ্ধান্ত হইল যে—ও একটা ফেরি।

যাহারা তা' মহাশয়কে আন্তরিক ভক্তিসহকারে প্রণাম করিত, তাহাদের মধ্যে হইতেই গোরাচাঁদ কহিল—"ওর বৌটা যে বলে তা মিথ্যে নয়। ও শালা একজন এক নম্বরের জোচ্চোর।"

হঠাৎ যাহাদের হরিভক্তি অতি-প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা ব'লিল—"ও শালা ঠ্যাটা, মস্ত দমবাজ।"

মোটা কথা, তা' মহাশয় অতিবেগে স্বীয় ভাষায় ও ভাবে জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন—সেইরূপ বেগেই তাহা নষ্ট হইয়া গেল।

তা' মহাশয় যে তাহা লক্ষ্য করিতেন না, তাহা নহে। তাহাদের প্রবৃত্তি দেখিয়া তিনিও লোকগুলার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। সাংসারিক সর্ব্বকার্য্যে তা'-দম্পতির অসংখ্য মতানৈক্য থাকা সত্বেও, তা' মহাশয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে উভয়েরই আশ্চর্য্য রকমের মতের মিল হইল।

তা' মহাশয় একটু হাসির মীড় টানিয়া বলিলেন—"তা' বটে, তোমার বুদ্ধি আছে—আমি এখন মান্‌চি। তুমি বারণ করেছিলে।"

গৃহিণী কহিলেন—"কেমন বারণ করি নাই? বল, বল,—বারণ করেছিলাম কি না?" শ্যামাঙ্গিনী যুবতীর উচ্ছ্বসিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে গৃহখানি কাংস্য-করতালের সুরে বাজিয়া উঠিল। স্বাস্থ্যপূর্ণ সুডৌল দেহের নৃত্যে তাহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

তা' মহাশয় বলিলেন—"হাঁ গো হাঁ, তাইত' বল্‌চি—তুমি বারণ করেছিলে।" একটু রসিকতা করিবার জন্য বলিলেন—"আমি হলাম বুড়ো, ৪৪ বছর বয়স হ'তে গেল, আর তুমি হলে গিয়ে এই কু—ড়ি কিনা নব যুবতীং। এখন তোমাদের বুদ্ধিরই তো বয়েস।"

মানুষ মাত্রেই প্রশংসা শুনিতে ভালবাসে; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকরূপ ময়দায় রূপের বা যৌবনের প্রশংসারূপ ময়ান পড়িলে অতি সুকোমল হইয়া পড়ে। নব যুবতী তা'-প্রিয়াও পুলকে ও হর্ষে একটু গল'-গল' ভাবে যথাসাধ্য কণ্ঠস্বরটীকে মোলায়েম করিয়া কহিলেন—"আমি তো এই জন্যেই তোমায় বক্‌তাম যে, মিছে ও ভড়ং' করে এই সব ভূতভোজন করান'। ওদের কি আর চক্ষুলজ্জা আছে? এরা একেবারে পাড়াগেঁয়ে ভূত—গরু—গরু।"

তা' মহাশয় বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন! গৃহিণীর বাক্য-বাহিনী অনর্গল ছুটিয়া চলিল—"এই দেখ' না, এই যে ৭।৮ মাস কাল ভুটিভুজং করে, আজ সত্যিনারায়ণের শিন্নী, কাল হরিন্নুট, পরশু মাল্‌সা-ভোগ অমুক তমুক করে এই সব পাড়াগেঁয়ে হাঘরেদের খাওয়ালে,—তারা তোমায় একটা দিনের তরেও মুখ ফুটে বল্‌তে পেরেচে—তা' মশায় আমার ঘরে আজ একটু মিষ্টিমুখ করে যান।"

তা' মহাশয় চিন্তিত মুখে বলিলেন—"তা বটে! কিন্তু দেখ"—আমি ভেবেছিলাম যে, পাড়াগাঁয়ে বসবাস করতে হলে, সবারই প্রিয়পাত্র হয়ে চলতে হয়। আর সে প্রিয়পাত্র হতে গেলে প্রথমটা খুব ধর্ম্মের ভড়ং টড়ং করে লোকগুলোর দুষ্ট মুখকে মিষ্টি করে দিতে হয়। কারণ তুমি তো জান না, এরা সব পারে! লোকের অনিষ্ট করতে এরা যেমন পারে, এমন আর কেউ পারে না। সহুরে লোক বদ্‌মাইসী বুদ্ধিতে পাড়াগেঁয়ে লোকের কাছে শিশু বললেই হয়। তুমি ওদিকে যতটা বোকা ভাবচ, ওরা কিন্তু তা নয়, ওরা অমনি ন্যাকা সেজে থাকে, সেটা ওদের অভ্যেস।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া ধাতব শব্দে বলিয়া উঠিলেন—"কেন? তাই বলে কি ওদিকে ভয় করে থাকতে হবে নাকি? ওঃ—ভারি ত' সব মরদ! আমরা কি ওদের চালে চাল বেঁধে বাস করি নাকি?—"

তা' মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন—"আস্তে, আস্তে, চালে চাল বেঁধে বাস করি না, কিন্তু জান তো? আমাকে যে নানান্ তাল সাম্‌লে চলতে হয়। কি জানি—কখন কি—"

গৃহিণী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিলেন—"ওঃ তুমি সেই কথা ভাবচ? সে তো কবে রফা হয়ে গেচে! সে আজ প্রায় তিন বছর হল না; সেই শ্রাবণ মাসে তো আমরা কাশী গিয়েছিলাম—যে বার তুমি ডিস্‌মিস্—"

"আঃ, চোপ, চোপ, ও সব কথা কেন? ইশারায় বললেই ত' হয় এত করেও তোমায় আমি আর পারলাম না! ছি ছি, মেয়েমানুষ নামাই কি এক? তোমাদের পেটে এত কথা থাকে, কিন্তু কাযের কথার বেলাতেই যত বেফাঁস?"

গৃহিণীর কথাটি মনঃপূত হইল না। তিনি কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া অপ্রসন্ন মুখে কহিলেন—"তবে আমায় আজ থেকে আর কোনো কথাই বলো না। আমার দ্বারা তোমার যদি অমঙ্গলই কেবল হয়, তবে আমায় দাদার কাছেই রেখে এস।"

তা' মহাশয় হতাশ্বাসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"ঐ নাও, ধান ভান্‌তে শিবের গীত!—দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে কেউ—"

হঠাৎ তা' মহাশয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। গৃহিণী দলিত-ফণা ভুজঙ্গীর মত কেবল উদ্যত-দংশন হইয়া ভ্রুকুটি-কুটিল নয়নে ঋজুভাবে দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় বহির্দ্বারে করাঘাত—"নলিনাক্ষ বাবু বাড়ীতে আছেন?"

স্বর অপরিচিত। গৃহিণীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তা' মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। জবাব দিলেন না। পুনর্ব্বার করাঘাত হইল—"ও নলিনাক্ষ বাবু—"

নলিনাক্ষ বাবু চকিতভাবে কেবল এদিক ওদিক উৎকর্ণভাবে চাহিতে লাগিলেন। গৃহিণী তিক্তকণ্ঠে ঝাঁজিয়া উঠিলেন—"বলি, বাক্‌রোধ হ'ল নাকি? জবাব দাও না! অমন এদিক-ওদিক চাচ্ছ কি?"

তা' মহাশয়ের চমক ভাঙ্গিল। থতমত খাইয়া কম্পিত জড়িত কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে কহিলেন—"কে—হাঁ—কে"—

"মশ্—সব বিট্‌কেল্" বলিয়া দ্রুত পশ্চাৎ ফিরিয়া গস্ গস্ করিতে করিতে গৃহিণী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

আগন্তুক আবার হাঁকিল—"ও নলিনাক্ষ বাবু, জবাব দেন্ না কেন, ছাই? কি বিপদেই পড়লুম।"

"যাই, যাই" বলিয়া শশব্যস্তে তা' মহাশয় ভীতিবিবর্ণ মুখে দ্বারদেশে গিয়া হাজির হইলেন।

আগন্তুক বেশ করিয়া তা' মহাশয়কে নিরীক্ষণ করিয়া, কহিল—"আমা চিন্‌তে পারচেন না? আমার নাম পুলিনবিহারী চৌধুরী। আমি নাদিরগঞ্জে সাতদিন ছিলাম আপনি যখন সেখানে রাইটার হেড কনেষ্টবল ছিলেন—মনে নাই?"

"ওঃ ওঃ আসুন্ আসুন্" বলিয়া অতি-ভক্তিভাবে তা' মহাশ নাদিরগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব দারোগাকে গড় হইয়া একটি প্রণাম করিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর এখানে যে? আমার বড় সৌভাগ্য"— কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর কুণ্ঠিত ও একটা অনির্দ্দিষ্ট ভীতিব্যঞ্জক। তা মহাশয়ের এই বিসদৃশ ভাব পুলিনবাবুর দৃষ্টি এড়াইল না!

পুলিনবিহারী কহিল—"আপনাকে বড়ই 'কিন্তু' 'কিন্তু' ঠেক্‌চে আপনি হয়ত' আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে আমি এখানে কী করে, নয় আমি শেরপুরে এলাম, এসেই শুনি যে আপনাকে ডিস্‌মিস্ করা হয়েে —আপনি কাশী চলে গিয়েচেন।"

তা' মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন—"আসুন্ না, আসুন্ না ভিতে আসুন বস্‌বেন্—ব'সে কথাবার্ত্তা হোক্‌গে।" বলিয়াই তিনি গৃহাভ্যন্তে হাত নাড়িয়া পথ-প্রদর্শন করিলেন—পুলিন বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার অনুসর করিয়া বারান্দায় বিস্তৃত ছোট মাদুরের উপর আসিয়া উপবেশ করিলেন।

তা' মহাশয় কহিলেন—"আমি তামাক সেজে, হুঁকোটায়—"

পুলিন বাধা দিয়া কহিল—"আমি তামাক খাই না। আমি

কাছে সিগারেট আছে—দরকার হলে খাব'। এখন কথাটা আগে সেরে নিই। আপনি বসুন্।"

তা' মহাশয় বসিলেন, কিন্তু তাঁহার মনটা কিছুতেই সুস্থির হইতেছিল না।

পুলিন কহিল—"আপনি খুবই ঘাব্ড়ে গেছেন, দেখ্চি। কোনো ভয় নেই—আপনার ভালর জন্যেই আমি এসেচি। আপনি বেশী ব্যস্ত হবেন না।" দ্বারের পার্শ্বে গৃহিণীর কাপড়ের খশ্খশ্ ও চুড়ির টুং টাং শব্দ শোনা যাইতেছিল। পুলিন সেদিকে একবার চাহিয়াই, মুখ ফিরাইয়া লইয়া, কহিতে লাগিল—"হাঁ, তারপর সেখানে থাক্তে থাক্তেই, নানা কারণে পুলিশের কাযে বড় ধিক্কারও জন্মাল'—রিজাইন্ দিলাম! আপনি জানেন, সেই সময়ে সারা-ব্রিজ্ তৈরি হচ্ছিল। সেখানে গিয়ে ঠিকেদারী সুরু কর্লাম, দু'পয়সা বেশ পাওয়াও গেল। এখন ভেবেচি যে দেশের মধ্যে কোথাও একটা ঠিকেদারী বা কোনো ব্যবসা ক'র্ব। আপাততঃ ঠিক করেচি যে, ইঁটের আর কয়লার কারবার কর্ব। এ দিকটায় অনেকগুলো কল কারখানা আছে, এখানে একটা ডিপো কর্ব। শুন্লাম, আপনিও বাড়ীতে আছেন, তাই ভাব্লাম, একবার দেখা করে একটা পরামর্শ করে, যা' হয় কিছু ঠিক্ করে ফেল্ব আজ।"

তা' মহাশয়ের বিহ্বলতা অনেকটা কাটিল, তিনি সোৎসাহে জানাইলেন—"বেশ তো, বেশ তো অতি সুন্দর প্রস্তাব। শাস্ত্রে বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—ব্যবসা ছাড়া কি আর কোথাও পয়সা আছে?……চাক্রী? তাতে আবার পুলিশের? ও সব কি

আপনাদের মত শিক্ষিত বড়লোকদের পোষায়, হুজুর? ও সব আমাদের মত লোকের। তা' এখন আমায় কি হুকুম?"

পুলিন হাসিয়া কহিল—"হুকুমই বটে! আমি জা'নতাম না যে এখানে আপনার বাড়ী বা আপনি বাড়ীতে আছেন! রাণাঘাটের বাবুদের ঐ উত্তর মাঠটা, ঐটে আমার ইঁটখোলার জন্যে নেব' মনে করে দেখ্তে এসেছিলাম—তারপর পরেশমোড়লের কাছে, আপনার নাম শুনে, ভাব্লাম, ভালই হল? দেখা করে যাই! আপনার মাথা খুব পরিষ্কার।"

তা' মহাশয় হেঁ হেঁ করিয়া গদ্গদ্ভাবে ভাববিভোর হইয়া শির কণ্ডূয়ন করিতে করিতে হাসিতে লাগিলেন।

পুলিন কহিল—"আমি ঠিক করেচি, এখানকার কাজ কর্ম্ম সব আপনি দেখ্বেন, আপনার মাসে যা' খরচ হয়, তা' আমি দেব। আমি কলিকাতায় থাক্‌ব, মাঝে মাঝে আসব—কিন্তু প্রতি শনিবার শনিবার গিয়ে আমায় হিসেব দিয়ে, সব খবরাখবর দিয়ে আস্‌বেন্। আমার আফিস—৪৪৯নং ক্লাইব ষ্ট্রীটে। কেমন রাজী আছেন?"

তা' মহাশয়ের সন্দেহমেঘ পনের আনা কাটিলেও, তিনি একেবারে ষোল আনা নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না—ভাবিতেছেন, এসব পুলিশের চাল নয় তো? কাজেই চট্ করিয়া তিনি কোনও সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

পুলিন বুঝিতে পারিল—নলিনাক্ষ তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই তাই বলিল—"আপনার এখনও মনের খট্কা সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। কিন্তু আমায় আপনি বিশ্বাস করুন্। বোধ হয় এইটুকু বললেই আপনি অভিপ্রায় বুঝ্তে পার্‌বেন্ যে, কাশীর ও এলাহাবাদের সব গোলমাল

আমায় সময়েই শেরপুরে থানায় আসে; আমি সে সব চাপা দিয়ে দিয়েছি। আপনি যে চালাক লোক, আপনাকে ধরে কে? আপনি তো নলিনাক্ষ তা'—রামনৃসিংহ বক্সী তো নন্? আর আপনি আপনার চেহারাও ত' আগাগোড়া বদ্‌লে ফেলেচেন্। কোনো ভয় নেই।"

তা মহাশয় নির্নিমেষে বিস্ফারিত নয়নে পুলিনের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পুলিন মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তা' মহাশয় হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মাথার মধ্যে বন্ বন্ করিয়া কি ঘুর্‌পাক খাইতেছিল। কাণের মধ্যে একটা তীব্র অস্ফুট শব্দ উত্থিত হইতেছিল—চক্ষের পলক পড়িতেছিল না।

অগ্রহায়ণ মাস। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আঁধার ঘনাইয়া উঠিল। সেই অস্পষ্ট সায়াহ্ণ-আলোকে পুলিন ও নলিনাক্ষ উভয়ে নীরবে অনাবৃত বারান্দায় বসিয়া। কাহারও মুখে কথা নাই। অকস্মাৎ মশক-বাহিনীর ঝঞ্ঝনা-নিনাদে পুলিনের মনে পড়িল, ফিরিতে হইবে। সে চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"তা'হলে কী? যা—হয়—একটা কিছু বলুন, নলিনাক্ষবাবু? আমায় ফির্‌তে হবে, সাড়ে সাতটায় আমার গাড়ী।"

তা' মহাশয় বলিলেন—"বেশ যা' বলবেন্, আমি তাই কর্‌ব—তার আর কি?"

"তা'হলে আমি এখানে একটা ডিপো খোলার বন্দোবস্ত করি?"

"বেশ—"

"কুঁতিয়ে 'বেশ' কেন? আচ্ছা, কাল আপনি একবার কলিকাতা গিয়ে আমার আফিসটা দেখে আস্‌বেন—আর সেইখানেই সব ঠিকঠাক করা যাবে, কী বলেন?"

"বেশ, বেশ, কিন্তু একটু জলটল খেয়ে—"

"না, না, আজ থাক্, অন্য আবার কতবার আস্‌তে হবে তো—তখন দেখা যাবে। নমস্কার।"

পুলিন দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তা' মহাশয় বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া, যতক্ষণ নজর চলে পুলিনের গন্তব্য পথপানে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া, যখন আর দেখা গেল না, বহির্দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী পূর্ব্বকলহ ভুলিয়া, নরম সুরে গদগদভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনিই কি নাদিরগঞ্জের সেই পুলিনবাবু?"

চিন্তিতভাবে তা' মহাশয় "হুঁ" বলিয়াই, তামাক সাজিতে লাগিলেন।

পরদিন আহারাদি সমাপ্ত করিয়া তা' মহাশয় দেড়টার গাড়ী ধরিবার জন্য বাহির হইলেন। গৃহিণী সকাল হইতেই স্বামীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—"যেন কোনও কথা ফাঁস করো'না! যতই হোক্, পুলিশে এককালে ছিল তো?"

তা' মহাশয় কহিলেন—"এখন আর পুলিশ কোথা? তবে হাঁ, গোয়েন্দাগিরিও তো কর্‌তে পারে; বিশ্বাস কি? না, সে সব কথা তোল্‌বারই বা প্রয়োজন কি? সাবধান থাকাই ভাল।"

গৃহিণী সন্তুষ্টচিত্তে আপনার কর্ম্মে মন দিলেন! তা' মহাশয় আহারাদি করিয়া তিনবার "দুর্গা শ্রীহরি" স্মরণ করিয়া যথাসময়ে বাহির হইয়া পড়িলেন। গৃহিণীকে বলিয়া গেলেন, সন্ধ্যা ছয়টার গাড়ীতে ফিরিতেই বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

শিয়ালদহে নামিয়া তা' মহাশয় হাটকোর্টগামী ট্রামে উঠিয়া বসিলেন।

কণ্ডাক্টর টিকিট দিতে আসিলে তাহার হাতে তিনটি পয়সা গুঁজিয়া দিয়া একটি বিড়ি ধরাইলেন। কণ্ডাক্টর চলিয়া গেল। হ্যারিসন্ রোডে যেমন এক ব্যক্তি নামিবার উপক্রম করিল, অমনি তাহার টিকিটখানি চাহিয়া লইয়া, কণ্ডাক্টর সেখানি তাড়াতাড়ি তা' মহাশয়ের হাতে গুঁজিয়া দিয়া গেল।

৪৪৯নং ক্লাইব ষ্ট্রীট—এক প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটকের উপর পিতলের হরফ তোলা ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে "চৌধুরী এণ্ড ব্রস"। তা' মহাশয় এ কক্ষ সে কক্ষ ঘুরিয়া বহু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া শেষে দ্বিতলে একটি কক্ষের মাথায় লেখা দেখিলেন—"চৌধুরী এণ্ড কোং"। সেখানেও কোনও ফল হইল না। ত্রিতল প্রকাণ্ড বাড়ীর সমস্ত কক্ষ সেদিন আর দেখা হইল না—সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তা' মহাশয় কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া, রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন।

বাড়ী ফিরিবার কথা তাঁহার মনেই ছিল না। আস্তে আস্তে গঙ্গার ধারে চলিতে লাগিলেন। খানিক দূর গিয়া হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, গাড়ী যে শ'পাঁচটায়!...তখন সাড়ে পাঁচটা! সব ভুলিয়া তখন তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল, কী করিয়া বাড়ী ফেরেন।...অনেকক্ষণ ভাবিয়া ঠিক করিলেন যে, গ্রামের নফর দাস গোয়াবাগানে থাকে, ছাপাখানায় কায করে, তাহার কাছে রাত্রিটা কাটাইয়া, আগামী কল্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া একেবারেই ফিরিবেন, আর আসিবেন না। ক্রমশঃ তা' মহাশয়ের সন্দেহ হইতে লাগিল—এ বুঝি গোয়েন্দা। অতীত কালের কৃত বহু কুকর্ম্ম তাঁহার মানসপথে উদয় হইতে লাগিল—আর

অগণিত বিদ্যুদ্দীপ-সমুদ্ভাসিত এই মহানগরী তাঁহার চক্ষে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। তিনি সজোরে মনের সমস্ত চিন্তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে গোয়াবাগান অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া, তা' মহাশয় নফর দাসের গৃহ যখন আবিষ্কার করিলেন—রাত্রি তখন নয়টা। নফর তাহার খোলার-চাল ঘরে—পরম সমাদরে ও অতিশয় ভক্তিভরে, তাহার সাধ্যাতীত রকমে, পরম হিন্দু তা' মহাশয়ের নৈশাহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

নানা দুশ্চিন্তায় ও দুঃস্বপ্নে রাত্রে তা' মহাশয়ের ভাল ঘুম হইল না। রাত্রি চারিটার সময়েই উঠিয়া নফরকে শোনাইয়া শোনাইয়া "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" নাম-মন্ত্র জপিতে জপিতে উঠিয়া পড়িলেন। নফরও উঠিল।

তা' মহাশয় নফরকে কহিলেন—"বাবা নফর, এবার আমি গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি, তুমি শোওগে যাও। এত সকালে উঠো না।"

নফর নিতান্ত বিনীত স্বরে কহিল—"সেকি কথা, খুড়ো ঠাকুর, সে কি কথা! আপনি—"

তা' মহাশয় একটু হাসিয়া কহিলেন—"আমার কথা বল্‌চ? আমার তো, বাবা, জানই, বাবা সত্যনারায়ণের আদেশ, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে প্রত্যহ স্নান কর্‌তেই হবে।······সত্যনারায়ণ, বাবা সত্যনারায়ণ, কলির একমাত্র দেব্‌তা। হিন্দুরা বলেন সত্যনারায়ণ, মোছলমানে বলে সত্যপীর। জিনিষ একই।" বলিয়াই উদ্দেশ্যে অতি-ভক্তিভাবে একটি প্রণাম করিলেন। দেখাদেখি নফরদাসও তদ্রূপ করিল।

"আর দেরি নয় বাবা" বলিয়া তাড়াতাড়ি তা' মহাশয় বাহির হইয়া পড়িলেন।

তা' মহাশয় আত্মপ্রসাদে বিভোর হইয়া বীডন্ ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িলেন। পথ জনশূন্য। মধ্যে মধ্যে ঘর্ঘর শব্দে জঞ্জাল-শকটগুলি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ছুটিয়া চলিতেছে।

হঠাৎ হেদুয়ার কোণে যেমন তিনি পৌঁছিলেন, অমনি এক তীব্র সুগন্ধে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন—কোন সন্ধানই মিলিল না। তা' মহাশয় পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যতই হেদো-পুষ্করিণীর ধারে আসিতে লাগিলেন; ততই সেই সুগন্ধ আরও স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। ফুট্‌পাথে চলিতে চলিতে তিনি ভাবিয়াছিলেন—হয়ত' কোনও ধনীর গৃহাভ্যন্তর হইতে এই গন্ধ আসিতেছে; হেদোর নিকটবর্ত্তী হইয়া ভাবিলেন, হয়ত' কোনও ফুলের গন্ধ! হেদোর পাড়ে, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি গিয়া দাঁড়াইলেন—তখন গন্ধটি অতিশয় স্পষ্ট ও তীব্র। তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। একি? এমন সুগন্ধ কোথা হইতে আসিল? তিনি বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন—গন্ধ কমে না, যেমন তেমনই রহিল। জলের ধারে গিয়া আস্তে আস্তে দাঁড়াইলেন—সেই স্বর্গীয় সুগন্ধ! এক অঞ্জলি জল লইয়া দেখিলেন যে জলেই গন্ধ—কে যেন রাত্রে হেদোর জল ছেঁচিয়া ফেলিয়া, সুমধুর গোলাপজলে পুষ্করিণীটিকে ভরাইয়া দিয়া গিয়াছে।

এ কী? এ কেমন করিয়া হইল? অনেকক্ষণ অতি-বিস্মিত থাকিয়া শেষে স্থির করিলেন—হয়ত' কোন দেবদেবী রাত্রে এই পুষ্করিণীতে

অবগাহন করিয়া গিয়াছেন—তাই এই গন্ধ। নচেৎ এ কী করিয়া সম্ভব ?.... এ অলৌকিক—এ অমানুষিক। এ স্বর্গীয়—এ দৈব !

কলিকাতার পথে একে একে একখান গাড়ী, দু' একটি বাবু, শ্যামবাজার ডিপো হইতে দক্ষিণাভিমুখী আরোহীহীন ট্রাম দেখা গেল। তা'. মহাশয়—একান্ত মনে, নিবিষ্টচিত্তে, সেই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া চিন্তায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

বাতি-নির্ব্বাপক বাতি নিভাইতে আসিয়া, তা' মহাশয়ের ধ্যানভঙ্গ করিয়া নিবেদন করিল—"গোড় লাগি বাবা" ! তা' মহাশয়কে 'বাবু' না বলিয়া কাহার-নন্দন যে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিল, তাহার কারণ তাঁহার সাধুবেশ। অর্থাৎ শিখা, রুদ্রাক্ষ, তুলসীর মালা, গৈরিকবসন, আলখেল্লা, নামাবলী, নগ্নপদ ও হস্তে কমণ্ডলু প্রভৃতি দেখিয়া। তা' মহাশয়—"জয় হোক্" বলিয়া আস্তে অস্তে, সিঁড়ির উপরে বাঁধান' স্থানটিতে আসিয়া দাঁড়াইতেই, কাহার-তনয় তাঁহার চরণপ্রান্তে দুইটি পয়সা দিয়া, পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, এ খুশবো আইল' কি করিয়ে ?"

তা' মহাশয়ের ধর্ম্মবুদ্ধি অকস্মাৎ রীতিমত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া, সেই বাঁধান ঘাটে ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"বাবা সত্যপীর আয়া হ্যায়—বুঝলে ? হাম্‌কে বিরক্ত মাৎ করো। যে যে জিজ্ঞাসা করেগা—তাদের সব্‌কো যেন বুঝিয়ে দেগা।" কাহারজা ভক্তিতে এমন গলিয়া পড়িল যে, সে তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া, কেবল প্রণামই করিতে লাগিল। চক্ষের আনন্দাশ্রুতে তাহার বক্ষবস্ত্র বাস্তবিকই আর্দ্র হইয়া উঠিল।

তা' মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'সত্যপীর, সত্যপীর, হিন্দু মুসলমান্ সব্বারই ঠাকুর হায়, জান্‌তা হায়? হাম্‌কো স্বপ্ন হুয়া হ্যায় যে আজ বাবা সত্যপীর হিঁয়া উঠেঙ্গে।”

ক্রমশঃ কলিকাতার বাবু-সম্প্রদায় ও পেন্‌সন্‌ভোগীরা প্রাতভ্রমণে হেদোয় আসিয়া দেখিলেন—এই অদ্ভুত ব্যাপার। সবাই সবাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—ক্রমশঃ লোকমুখে. বেলা ৭টার মধ্যেই উত্তরাঞ্চলে আর কাহারও জানিতে বাকী রহিল না যে—হেদোর পাড়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন; তাঁহার স্বপ্ন হইয়াছে যে বাবা সত্যপীর হেদোর জলে আসিয়া লুকাইয়া আছেন। মেয়েরা সকল কর্ম্ম ফেলিয়া, কেহ হাঁটিয়া, কেহ গাড়ী চড়িয়া আসিয়া জমিতে লাগিলেন—লোকে লোকারণ্য। এত গাড়ী মোটর প্রভৃতি জমিয়া গেল যে, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়া গেল।

অনেক ব্রাহ্ম ও দেশীয় খৃষ্টান বৃদ্ধ ও মহিলারাও আসিয়া গোলেমালে নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিকের পথ ও হেদোর পাড় বহু নরনারীতে ভরিয়া উঠিল! মুসলমানেরা নমাজ আরম্ভ করিল। ধ্যানস্তিমিত লোচনে তা' মহাশয় নিশ্চল রুদ্ধশ্বাসে স্থানুমূর্ত্তির মত উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে টাকা পয়স' ও রেজকীর এক প্রকাণ্ড স্তূপ জমিয়া উঠিল। কে দিতেছে বোঝা যাইতেছে না, কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে কেবলি টাকা পয়সা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। একে লোকের কোলাহল, তারপর কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি করিতেছে, কেহ “জয় বাবা সত্যপীরের জয়” হাঁকিতেছে,—বৈরাগীর দল হৃষ্টপুষ্ট সচিত্র নধর দেহে খোল করতাল যোগে হরিনাম জুড়িয়া দিয়াছে—বেলা

৮টার মধ্যেই হোদোর পাড়ে এক রৈ রৈ ব্যাপার আরম্ভ হইয়া গেল।

স্থানে স্থানে সেই মানব-মেলার মধ্যে মণ্ডলাকারে কয়েকজন মিলিয়া আলোচনা করিতেছে, সেখানে আরও পাঁচজন উৎকর্ণ হইয়া গিয়া ভীড় ঠেলিয়া দাড়াইতেছে ; কোথাও কেহ বা তা' মহাশয়ের সম্বন্ধে কল্পিত নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচার করিতেছে, কেহ বা প্রশ্ন করিতেছে, কেহ উত্তর দিতেছে ইত্যাদি প্রকারে একটা মহাব্যাপার ঘনাইয়া উঠিল। তা' মহাশয় ধ্যান-নিমীলিত-নয়নে আপনার বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ অর্থাগমের অতি-সাচ্ছল্যের স্বপ্নে বাস্তবিকই তন্ময় হইয়া গেলেন। মধ্যে মধ্যে পরোক্ষে ঈষৎ মুক্তনেত্রে সম্মুখের অর্থস্তূপের পানে লোলুপ দৃষ্টিও হানিতেছিলেন।

যত বেলা বাড়িতে লাগিল, লোক-সমাগমও ততই বাড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ অফিসযাত্রী ও বিদ্যালয়গামী বাবু ও ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া মহিলার সংখ্যা হু হু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকলেই এক এক ঘটি জল তুলিয়া লইতে লইতে হেদোর জলও কমিতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ প্রায় ১০।১৫ জন হিন্দু মুসলমান কনেষ্টবল সহ, ফিরিঙ্গি ইন্‌স্‌পেক্টারের নেতৃত্বে জন দুই দেশীয় দারোগার চালনায় এক বিপুল পুলিশবাহিনী সেই প্রচণ্ড ভীড় ঠেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হইয়া গেল—সমস্ত শব্দ, এমন কি হরিসংকীর্ত্তন পর্য্যন্ত মধ্য-পথে থামিয়া গেল। উপস্থিত জনমণ্ডলী ভাবিল—একি! পুলিশের এ কী অত্যাচার?

ইন্‌স্‌পেক্টর হুকুম দিল—জাল নামাও। তৎক্ষণাৎ অমনি ৫।৬ জন

জালিক জলে নামিয়া জাল খাটাইতে সুরু করিয়া দিল। ধর্ম্মে আঘাত ? এই পবিত্র জলে—যেখানে স্বয়ং সত্যপীর আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন—সেখানে জাল কী জন্য ? তাঁহাকে শীকার করিতে নাকি ? উত্তেজিত জনসঙ্ঘ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। সাহেব ও দারোগাদ্বয় তাহাদিগকে কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করিতে আদেশ দিল।

তা' মহাশয় বেগতিক দেখিয়া, হঠাৎ ধ্যান-ভঙ্গের অভিনয় করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে শূন্য দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন সকলেই জাল টানার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—তাঁহার দিকে কাহারও আর লক্ষ্য নাই। তিনি টাকা পয়সাগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সকলে মহা কলরব করিয়া উঠিল। জাল টানিয়া উঠাইলে দেখা গেল, চারিটি বড় বড় পিপা উঠিল—পিপায় টিনের চাকৃতিতে লেখা আছে—মেসার্স গোবরগণেশ এণ্ড কোং, ১৭২ নম্বর ভবানীপুর, কলিকাতা।

সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, পুলিশের ছোট কর্ত্তাদের মুখপানে চাহিল। একজন দারোগা একটু রঙ্গ করিয়া কহিল—"একটি নয়, একেবারে চার চারটি সত্যপীর! কারো যদি পুজো-টুজো কর্‌তে হয়, তো এই বেলা করে নিন—আমরা আবার এ বিগ্রহগুলিকে থানায় নিয়ে যাব' কিনা ?" সকলে অবাক্! তখন দারোগা বাবু বলিলেন—"আগে বাবার, ভগীরথকে আনা যাক্! রামবিরিচ সিং, উসকো হিঁয়া লে আও।" রামবিরিচ সিং পলায়মান বাবাঠাকুরকে টাকা-পয়সার পোঁট্‌লা-সুদ্ধ আনিয়া হাজির করিল।

দারোগাবাবুকে দেখিয়াই তা' মহাশয় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অস্ফুটস্বরে কহিলেন—"পুলিনবাবু!"

দারোগাবাবু বলিলেন—"ব্রহ্মচারীঠাকুরের নামে চা'রখানা ওয়ারেণ্ট আছে। উনি পুলিশ হ'তে লাথি খেয়ে বেড়িয়ে আগ্রা, কাশী, এলাহাবাদ ও গয়ায় এই চার জায়গায়, চারটি মাড়োয়ারী তহবীল তসরুপ করে এখন বাবাঠাকুর হয়েছেন অনেক কষ্টে ওঁর দর্শন পাওয়া গেছে।"

. জনতার মধ্যে মুক্তির একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা গেল। নিমেষ মধ্যে গিস্ গিস্ ফিস্ ফিস্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল, এ পিপের ব্যাপারটা কি ?

দারোগাবাবু বলিলেন—"গোবরগণেশ কোং বিলেত হতে এই পিপের করে' চার পিপে বিলিতী এসেন্স আনিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ওই জিনিষই শিশিতে পূরে নাম-ফের করে স্বদেশী এসেন্স বলে বাজারে চালাবেন। মাল ছাড়িয়ে এক গাড়োয়ানের গাড়ীতে বোঝাই করে দিয়ে তিনি কর্ম্মান্তরে গেলেন। গাড়োয়ান্ কল্‌কাতায় নূতন, সে ভবানীপুর চিন্‌তে না পেরে বরাবর বেল্‌গেছে চলে আসে। সারারাত ঘুরে সে আর পথ ঠাওর কর্‌তে পার্‌লে না—অথচ যার মাল সে ওদিকে পাছে হুজ্জৎ বাধায় এই ভেবে, সে এই ভোর বেলায় পিপে চার্‌টে হেদোর জলে ফেলে দিয়ে পালাচ্ছিল—বিটের কনেষ্টবল তাকে সন্দেহ করে থানায় নিয়ে যেতেই সে সব কথা বলে। তারপর ভবানীপুর থেকে খোঁজ খবর কর্‌তে যা' দেরী—এসে দেখ্‌চি যে একেবারে বাবা সত্যপীরের আবির্ভাব!"

লোকগুলি নির্ব্বাক বিস্ময়ে নিঃশব্দে শুনিতেছিল। দারোগাবাবু বলিলেন—"কি তা' মশায়? না, না, ব্রহ্মচারী মশায়—উঠুন্, চলুন! সত্যপীরের আবির্ভাব তো থানায়, এখানে কোথায়?"

দ্বীপান্তর

—•—

প্রথম পরিচ্ছেদ

কি করিবে? বেচারার অদৃষ্টে ছিল, তাই এমনটা ঘটিল। পুলিশের কাছে রামু কেবল বলিল যে, সে নির্দ্দোষী। পুলিশ কেন,—কেহই সে কথা বিশ্বাস করিল না।

অন্ধকার রাত্রি—রামু একা যাইতেছিল। এমন সময় পথ-পার্শ্বের একটা ঘর হইতে মানুষের গোঁয়ানি শুনিতে পাইয়া প্রথমটা সে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া খানিকক্ষণ শুনিল; দেখিল, অস্ফুট আর্ত্তনাদ থামেও না, কমেও না। রামু সে বাড়ীর কড়া নাড়িয়া একবার শব্দ করিল, কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল না; দ্বিতীয়বার কড়া নাড়িল, তবুও সাড়া নাই। পাড়া নিশুতি—কাহাকেই বা সে ডাকে, কী করে, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, রামু সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দুয়ার খোলাই ছিল।

উঠানে দাঁড়াইয়া "কে আছ গো" বলিয়া দুই তিন বার সে ডাকিল—কেহই উত্তর দিল না। অথচ ঘরে সেই গোঁ গোঁ শব্দ। একে অপরিচিত জায়গা, অজানা বাড়ী, এই দুপুর রাত্রি,—রামুর গা'টা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে হঠিবার পাত্র নয়। শব্দ লক্ষ্য করিয়া

ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কিছুই দেখা যায় না! ঘুটঘুটে অন্ধকার। রামুর গায়ে একটা পিরাণ ছিল—তার পকেটে দিয়াশলাই ছিল। দিয়াশলাই জ্বালিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। কম্পিতহস্তে কাঠি জ্বালিতে জ্বালিতে সে একটি কেরোসিনের ডিবি খুঁজিয়া পাইল, সেটি জ্বালিল।

রামু দেখিল—তক্তপোষে একজন পুরুষ তিন চারি টুক্‌রা করিয়া কাটা। রক্তে বিছানা, ঘর সব লাল। মৃতের মুখ বিকৃত, চিনিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। মেঝের উপর একটি যুবতী, হাত-পা-মুখ সব বাঁধা—কেবল গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। তৈজসপত্রাদি সমস্ত এলোমেলো, বিধ্বস্ত, চারিদিকে ছড়ান। কাঠের একটি বড় সিন্দুক আছে, সেটাও ভাঙ্গা।

রামুর আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। ডাকাতেরাই রমণীকে এইরূপ বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে এবং অনুমানে বুঝিল যে, হতব্যক্তিই গৃহকর্ত্তা—এই রমণীর স্বামী।

রামু সর্ব্বপ্রথম যুবতীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, বাহির হইতে জল আনিয়া, জলের ছিটা দিয়া, তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। রমণী সুস্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সেই শব্দে পাড়া-পড়শী সকলেই আসিতে আরম্ভ করিল। "ডাকাত, ডাকাত, খুন্ খুন্" শব্দে অদূরবর্ত্তী ফাঁড়ি হইতে পুলিশও আসিয়া হাজির হইল। এই অসময়ে অপরিচিত জনসঙ্ঘের ভিতরে ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পড়িয়া রামচন্দ্র হতভম্ব হইয়া গেল।

পলায়নে অক্ষম এই অপরিচিত ব্যক্তিই যে পলায়িত দস্যুদলের একজন—ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না, পুলিশের জমাদার

সাহেবেরও না। তখন সকলেই অকাল-নিদ্রাভঙ্গের রাগটা রামুর পৃষ্ঠের উপর দিয়া কতকটা মিটাইয়া লইল। হিন্দুস্থানী জমাদারসাহেবও ভাঙ্গা বাংলায় তাঁহার বাংলাজ্ঞানের বাছাই নমুনাগুলি রামুর উপর প্রয়োগ করিয়া মুখে খানিকটা "খৈনী" পূরিয়া দিলেন।

প্রহারে, গালিতে, অপ্রত্যাশিত আকস্মিক এই বিপদে, বিড়ম্বনায় রামুর মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়া পড়িল। ততক্ষণে চৌবেজী সিপাহী এক-নিশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ফাঁড়ি হইতে হাতকড়ি লইয়া আসিল।

রামু মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত বাড়াইয়া দিল। সকলের আগে আগে থানায় হাজির হইল! হাজতঘরে ঢুকিতেও দ্বিধা করিল না।

হাজতের এক ক্ষুদ্র কক্ষে, কত কত দিনের কত কত দোষী-নির্দ্দোষীর সুগভীর মর্ম্মতাপের বদ্ধ-বাতাসে রামুর যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। সে তাহার নিজের অবস্থার আলোচনা করিতে চায়, কিন্তু তাহার কোন সূত্রই পায় না। রামু ভাবিল, কী ঘোর দুঃস্বপ্ন! "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং" বলিয়া চক্ষু মুছিল—চারিদিকে একবার হাত বুলাইয়া দেখিল যে, এ স্বপ্ন নয়—কঠোর সত্য। সে আর থাকিতে পারিল না। শিশুর মত গুমরিয়া গুমরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া যে কোন ফল নাই, তাহাও সে বুঝিল—তথাপি এ জলস্রোতকে সে বাধা দিতে পারিল না।

সে যে নিরপরাধ, বিপন্নকে উদ্ধার করিতে আসিয়া এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছে—একথা কেহই শুনিল না। কারণ একে সে অপরিচিত তাহাতে ঘটনাস্থলে ধৃত;—অথচ এত রাত্রে সে যে এখানে কী করিয়া আসিল, ইহারও কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ সে দিতে পারে না।

নিঃসহায় রামচন্দ্র আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া—অগত্যা বিধি-লিপিতেই নির্ভর করিয়া রহিল। কিন্তু তাহা পারে কৈ? তাহার সমস্ত চিত্ত শতমুখে নীরবে নিবেদন করিতেছিল—"ওগো আমি যে নিরপরাধ! আমাকে বিশ্বাস কর"। সে যে নিরপরাধ, এই অবিশ্বাস্য সত্য কথাটীকে অবাধ অশ্রুজল ভিজাইয়া ভিজাইয়া কেবল ভারিই করিয়া তুলিতে লাগিল!

রামচন্দ্র শুনিল, রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে এজাহার দিল—সাত আটজন লোক এসেছিল;—এ ব্যক্তিও তাদের মধ্যে একজন।

রামের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডাকাতি হইয়াছে মাঝেরগ্রামে। এখান হইতে চন্দ্রপুর বার ক্রোশ দক্ষিণে। চন্দ্রপুরে তাহার বাড়ী। বাড়ীতে তাহার স্ত্রী ও একটি চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক পুত্র—কিশোর। এই দুইটি প্রাণী লইয়াই রামুর সংসার।

রামু লোকটার স্বভাব ছিল খুব অদ্ভুত। মুখটা বড়ই আল্গা ও কর্কশ; সামান্য কারণেই সে চটিয়া উঠিত; কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথাই কহিত না; নিজেও কাহারও গৃহে যেমন বিনা কারণে যাইত না, তেমনই নিজ গৃহেও কাহাকে সে অকারণ ডাকিত না। রামু এদিকে স্বল্পভাষী, কিন্তু 'কুকথায় পঞ্চমুখ'কেও হার মানাইয়া দিত।

এককালে রামুর অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তাহার উঠানে, খামার-বাড়ীতে কিছু কম হইলেও বত্রিশটা গোলা এবং মরাই থাকিত; পনেরখানা লাঙ্গলের চাষ ছিল—কত লোক তার চাকরী করিত। আজ তার "তেহি নো দিবসা গতাঃ।" জমিদারের সঙ্গে এক মামলা বাধাইয়া তুলিয়া, মারপিট করিয়া—শেষে পণ করিয়া বসিল, খড়কেগাছি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও সে মোকদ্দমা চালাইবে। ঘটিলও তাই। দুই তিন বৎসরে মকদ্দমা যখন মিটিল—তখন রামু দেখিল, তাহার আর কিছুই নাই। বিচারালয়ের পাণ্ডাদের অবশিষ্ট প্রসাদ যেটুকু আছে, তাহাতে কোনও মতে কষ্টেস্থষ্টে তাহার দুইবেলা দুইমুষ্টি অন্ন হইলেও

হইতে পারে। কিন্তু রামু তাহাতে দুঃখিত বা চিন্তিত হইল বলিয়া বোধ হয় না—কারণ সে বুক ঠুকিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"মকদ্দমা তো জিতেচি!" এ দশ বৎসর আগেকার ঘটনা।

জমিদারকে যে চাষা মকদ্দমায় হারাইতে পারে, গ্রামে যে তাহার কী প্রতিপত্তি, তাহা বলা শক্ত; অর্থাৎ যদি কখনও বঙ্গীয় চষা-বংশ তাহাদের স্বজাতির ইতিহাস রচনা করে, তাহা হইলে রামচন্দ্রকে যে তাহারা গ্যারিবল্ডি, ম্যাটসিনি প্রভৃতি বীরবর্গের সহিত এক-আসন দিবে—একথা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি।

উক্ত কারণে এবং তাহার খামখেয়ালী-মেজাজের দরুণ গ্রামের সকলেই রামুকে একটু ভয় করিত। কাজেই রামচন্দ্র মণ্ডলের প্রতিপত্তি ছিল অপ্রতিহত।

রামুর অবস্থা যখন বেশ চল্‌তি ছিল, তখন সে লোককে বিনা-সুদে টাকা দিত; তখন দিন গেলে কোন্ না দশবিশখানা পাতাও পড়িত; তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণবাড়ীতে সিধা, ঠাকুরবাড়ীতে ভোগ, কালীবাড়ীতে পূজা এ ত প্রায়ই সে পাঠাইত। আর তখন মেজাজটাও এত খারাপ ছিল না। মুখেও হাসি ছিল। আজকাল রামু বাড়ীতেও খুব অল্প কথা কয়, অবসর পাইলেই সে খামারবাড়ীর চালায় তালপাতার বুনানি একখানি চাটাইয়ে বসিয়া তামাক খায়। মুখখানা চব্বিশ ঘণ্টাই গম্ভীর। মুখ ফুটিয়া সে রাস্তার লোককে একবারও বলে না—"ওগো, একবার এসে এই তৈরি তামাকটা খেয়ে যাও।" যদি কোনও ভিন্ গাঁয়ের কোনো পথিক কখনও স্বেচ্ছায় তাহার নিকট তামাক খাইতে আসিত, তাহা হইলে সে তাহাকে একটু মিষ্টমুখ না করাইয়াও ছাড়িত না। তাহার অনুরোধে এমনি একটা

আদেশ থাকিত যে, যে আসিত, তাহাকে ভরাপেটে মুখের পান ফেলিয়াও একখানা বাতাসা ও একটু জল খাইতেই হইত।

গ্রামের বয়স্ক লোক রামুকে যেমন ভয় করিত এবং তাহার প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব পোষণ করিত, ছোট ছোট ছেলেরা তেমনই তাহাকে খুব ভালবাসিত। পাঁচ ছয় সাত আট দশ বৎসরবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা মোড়ল মহাশয়কে দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। সারাদিনই অন্তত দু'টি তিনটি ছেলে রামুর সহচর থাকিতই। মাসের অর্দ্ধেক দিন তাহাদের মোড়ল-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইত—পূজা-পার্ব্বণে কোন সামগ্রী বা দুই-।একটা পয়সা তাহারা সকলেই পাইত। ইহাদের সঙ্গে রামু হাসিত, খেলিত, এবং সময়ে সময়ে কোনও বালকের অদ্ভুত আব্দার পূর্ণ করিতে কচি পেয়ারাটি পাড়িয়া দিবার জন্য রামচন্দ্র গাছে পর্য্যন্ত উঠিত।

সংসারে এত টানাটানি, অথচ পাঁচপরের ছেলেপিলের জন্য অর্থের অপব্যয়হেতু মোড়ল-গৃহিণী যদি কখনও তাহার স্বামীকে কিছু বলিত—ত' রামু বিরক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চুপ করিয়া কেবল শুনিয়া যাইত; বিরক্ত হইলে মুখ খিঁচাইয়া পত্নীকে বুঝাইয়া দিত যে, রামু তাহার শ্বশুরের পয়সা খরচ করিতেছে না।

সময় যখন যাহার মন্দ পড়ে, তখন সে ভাল করিলেও মন্দ হয়। রামুকে যে ছেলেরা ভালবাসিত, রামুর কাছে সর্ব্বদা যাওয়া আসা করিত—তাহাতে তাহাদের পিতামাতা অভিভাবকগণ তাহাদিগকে নানারূপে নিগৃহীত করিত। রামুর উদ্দেশেও বলিত—"হতভাগা বুড়ো ড্যাক্‌রা, সব্বারই সর্ব্বনাশ করবে—আবার ছেলে ভুলিয়ে সাধু সাজতে যায়?"

বছর দুই আগে যে মদনা গোয়ালার সঙ্গে বচসাসূত্রে তাহার এক-ক্ষেত্ত

কলাই রামু নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার গরু দিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছিল; এবার বর্ষায় তাহার কুঁড়ে ঘরখানি পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া রামু যে নিজ-ব্যয়ে সেখানি উঠাইয়া দিয়াছে, ইহাতেও লোকে রামুকে গালি না দিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল—ঘাটে-পড়া বুড়োর ঠাট্ দেখে বাঁচি না। ম'লে গাঁয়ের আপদ যায়!

লোকের মুখে কি হাত দেওয়া যায়? লোকে যাহাই বলুক না কেন, ইতিহাস কিন্তু শ্রীমান রামচন্দ্র মণ্ডলকে সপ্তত্রিংশ বর্ষের অধিক পুরাতন বলিয়া স্বীকার করেন না। তবে অল্প বয়সেই তাহার মাথায় বৃদ্ধত্বের ছাপটা পড়িয়া গিয়াছিল, এই যা'।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামু গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার নাম করিয়া মাঝেরগাঁয়ে গিয়া ডাকাতি করিয়াছে, খুন করিয়াছে, এ খবর দেখিতে দেখিতে গ্রামেও আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমটা সকলেই বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া গেল ;—ক্রমে ক্রমে সকলের মুখেই একটা আশ্বস্তির জ্যোতিঃ ফুটিতে লাগিল। রামুর দ্বারা যে এ প্রকার কার্য্য হইতে পারে, ইহা সকলেই বিশ্বাস করিল ; যে দুই চারিজন অবিশ্বাস করিতেছিল, তাহারাও মুখ ফুটিয়া সাধারণের ঈদৃশ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না।

রামুর গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহার পত্নী বুক চাপড়াইয়া মাথা খুঁড়িয়া রক্তারক্তি করিয়া ফেলিল। চন্দ্রপুর গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নয়—কিন্তু মোড়ল পরিবারের এমন বিপদের দিনে আন্তরিক সহানুভূতি কেহই দেখাইল না। অনেকেই আসিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই সান্ত্বনার বদলে গায়ের ঝালই ঝাড়িয়া গেল ; বহু দিনের চাপা-কথা প্রকাশ করিয়া বাঁচিল। "রামুর ফাঁসি এবার নিশ্চিত" "এত অত্যাচার কি সয় ?" "পাপের কি সাজা নেই ?" "ধর্ম্ম যদি না থাক্‌বে ত' সংসারটা চল্‌বে কি করে ?" প্রভৃতি শ্লেষে, ব্যঙ্গে, টিটকারিতে, রঙ্গে এই নিরুপায়, আর্ত্ত, বিপন্ন, মাতা-পুত্র শোকের অপেক্ষা শঙ্কাতেই অধিক কাতর হইয়া পড়িল।

ঘটনার পর তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে জেলা হইতে সদলবলে পুলিশসাহেব চন্দ্রপুরে তদন্তে আসিলেন। রামুর গৃহে খানাতল্লাসী হইল। কতকগুলি

উলুখড়কাটা দা', পাঁঠাকাটা খাঁড়া, মাটি খোঁড়ার শাবল প্রভৃতি ডাকাতির সহায়ক অস্ত্র সন্দেহ করিয়া তাঁহারা লইয়া গেলেন—আর এমন করিয়া বাড়ীখানি এলোমেলো করিয়া দিয়া গেলেন যে, ডাকাতেরাও সেরূপ করে না। রামুর পত্নী ও পুত্র কনেষ্টবল হইতে পুলিশ সাহেবের পর্য্যন্ত পদলুণ্ঠিত হইয়া কত কাঁদিল, কত কাকুতি-মিনতি করিল,—কিন্তু কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। পুলিশ সাহেব নূতন, একবার কহিলেন—"হামি কি ক'রবে মাঈ, হামি সরকারী নোকর। মট্‌ রোও টুম্—আডালট্‌মে যো হোগা ওই হোবে! আবি মট্‌ ডরো।"

গ্রামের সাতকড়ি বিশ্বাস, তিনু চৌধুরী, হরিশ মোড়ল, শিবু রাজবংশী, রাজকৃষ্ণ ভট্‌চাজ, যোগিন্‌ চাটুয্যে, যদু সা প্রভৃতি মাথালো মাতব্বর ব্যক্তিগণ পুলিশ সাহেবের নিকট তাঁহাদের নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়া আসিলেন। কে যে কি বলিলেন, তাহা ত' পূর্ব্বেই গ্রামের অশ্বথতলায় ঠিক হইয়া গিয়াছিল—সুতরাং সকলেই যে এ বিষয়ে একমত তাহা আমরা পুলিশের গোপনীয়-রিপোর্ট না দেখিয়াও জানিতে পারিয়াছি।

আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। রামু পুলিশের নিকট যে এজাহার দিয়াছিল, আদালতেও তাহাই বলিল, একটি কথারও এদিক-ওদিক করিল না। তাহার সঙ্গে আর কে কে ছিল, প্রভৃতি প্রশ্নে সে এক উত্তরই দিয়া আসিতেছে যে সে—নিরপরাধ; সে এ ডাকাতির কিছুই জানে না।

রামুর গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত বড় বড় চক্ষু দুটিতে দৃষ্টি স্থির; বলিষ্ঠ দেহখানি অটল এবং নির্ভীক; মুখশ্রীতে একটা সুগভীর ব্যথা ও বিষণ্ণতার ছায়া সর্ব্বদা মুখটিকে আশঙ্কিত ও মলিন করিয়া রাখিয়াছিল। মাথা নত

করিয়া সে প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া কাঠগড়ায় ঢোকে—আবার দিনান্তে তেমনি নিরুপায় শ্লথগতিতে কারাগারে প্রবেশ করে।

পক্ষসমর্থনের জন্য রামু কাহাকেও অনুরোধ করিল না, কিন্তু সে দেখিল, দুইজন বিখ্যাত উকীল বিনা অনুরোধেই রামুর কার্য্য করিতে লাগিলেন। রামু শুধু কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মকদ্দমা দায়রা সোপর্দ্দ হইল। জজসাহেব দয়াপরবশ হইয়া ফাঁসি না দিয়া দশ বৎসর দ্বীপান্তর-বাসের আজ্ঞা দিলেন। দণ্ড শুনিয়া রামু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সেই দিন রামু তাহার উকীল দুটিকে ডাকিয়া কাছে আনিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছিল—এবং কী বলিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও বলিতে না পারিয়া, কাঁদিয়া মাটি ভিজাইয়া ফেলিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দণ্ডাজ্ঞা দিয়া জজ সাহেব স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য রামুকে কিছুক্ষণের ছুটি দিলেন।

রামু গম্ভীরভাবে পুত্র কিশোরকে বলিল—"বাবা কিশুরি, কারু সঙ্গে কোন রকম গোলমাল যেন ক'রো না। ভগবান্ যা' করেন ভালর জন্যেই। এই সাজা আমার পূর্ব্বজন্মের পাওনা ছিল—তাই হ'য়ে গেল। এর জন্য দুঃখ ক'রো না।"

রামুর কণ্ঠস্বর সতেজ, চক্ষু শুষ্ক।

কিশোর কাঁদিয়াই আকুল, সে বলিবে কী? বলিল—"যারা তোমার নামে মিথ্যে—"

রামু বাধা দিয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—"খবরদার।"

স্ত্রী কাঁদিতেছিল। এই তিন মাসে সে এমন কাহিল ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে আর চেনাই যায় না।

রামু স্ত্রীকে বলিল—"সংসার বরাবরই যেমন চল্‌তেছে—তেম্‌নি করেই চালিও। আমার জন্যে কোনও চিন্তা ক'রো না। দশটা বছর তো দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কেটে যাবে। আমার অদৃষ্টে যা' ছিল তা খণ্ডাবে কে? এতে কারুরই দোষ নেই।"

ঝম্‌ঝম্ করিয়া লৌহ-শৃঙ্খল বাজাইতে বাজাইতে রামচন্দ্র কারাগারাভিমুখে রওনা হইল; একবার ফিরিয়াও পিছনে চাহিল না।

রামু যে সত্যসত্যই খুনে-ডাকাত, আজ তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

রাত্রে নির্জ্জন অবরোধ-কক্ষে বসিয়া নিদ্রাহীন রামু ভাবিতেছিল—"নিশ্চয়ই আমি খুন করেচি। আমি ডাকাতি করতেই গিয়েছিলাম। হয়ত আমার মনে নাই, কিম্বা বরাবর ভয়ে আমি মিথ্যে কথাই বলে এসেচি।" রামু যে নিরপরাধ, এখন আর সেকথা সে নিজেও ভাবিতে পারিল না।

এক একবার স্ত্রী, পুত্র, ঘরসংসারের কথা মনে পড়ে ত, রামু তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া সে চিন্তাকে অপসৃত করিতে চাহে—কিন্তু সরানো জলের মত তাহারা আবার তখনই আসিয়া জমে। এই কারা-কক্ষখানিকে সে যে চিন্তাশূন্য করিতে চায়—কারণ এখানে তাহাকে এখন দশ বৎসর থাকিতে হইবে।

পত্নীর অশ্রুসিক্ত, বেদনাতুর, ভরসাহীন দৃষ্টি, পুত্রের হতাশ ব্যথাঙ্কিত রোরুদ্যমান বদন-মণ্ডল, পাড়ার ছেলেগুলির সেই সুমধুর আদর আপ্যায়ন—বায়োস্কোপের ছবির মত, বাস্তব অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে একে একে রামুর মানসপটে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। সংসারের কাজকর্ম্ম, আয়ব্যয় প্রভৃতিও সে আলোচনা করিল। একটি চৌদ্দ-বৎসরের বালকের উপর সংসার! গ্রাম শত্রুপূর্ণ! হয়ত এই দুটি নিরবলম্বন নিরুপায় মাতাপুত্র লোকের উৎপীড়নেই মরিয়া যাইবে। দরদরধারে শীর্ণ কপোল বাহিয়া রামুর তপ্ত অশ্রুধারা পাষাণপুরীর পাষাণকুট্টিমে টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

.প্রথম চারপাঁচ মাস কিশোরদের খুব কষ্টেই কাটিল। সাংসারিক কষ্ট অপেক্ষা লোকের ঠাট্টাবিদ্রূপেই ইহারা মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইতে লাগিল। গ্রামের জমিদার হইতে নিম্নতর হাড়ি ডোম অবধি সকলেই আপন আপন সাধ্যমত কিশোরদের শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা রামুর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত, তাহারাই রামুহীন এই নিরাশ্রয় পরিবারের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীর পিছনে কিশোরদের একটা বাগান ছিল—সকালে দেখা গেল ভাল ভাল কলমের আমের চারাগুলি কে কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। বেড়ের বাগানে ফলমূল যাহা ফলে, সন্ধ্যায় বেশ থাকে, কিন্তু সকালবেলায় আর তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। বাড়ীর পাশে একটা গর্ত্তে বর্ষার জল জমিত; সেটাতে কিশোরদের কিছু মাছ ছাড়া ছিল;—সেদিন কি প্রয়োজনে কিশোর জাল নামাইল; উঠিল কেবল শামুক, গুগলি ও পানা। এইরূপে লোকে কারণে অকারণে তাহাদিগকে বড় উত্যক্ত করিয়া তুলিল।

উৎপীড়নে সুখ হয়, যদি উৎপীড়িত উৎপীড়ককে বাধা দেয় বা উৎপীড়িত ব্যক্তি কাতর হইয়া প্রকাশ্যে উৎপীড়ন স্বীকার করে।: কিশোর পিতৃ-আজ্ঞায় কাহাকেও কোন বাধা দিল না; যাহার যেমন ইচ্ছা, সে সেইরূপ ভাবেই কিশোরদের জীবিকা-নির্ব্বাহের পথে কণ্টক বিছাইল।

কিন্তু যাহার জন্য এত করা, সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপই করিল না! হাসিমুখে অক্ষত-চরণে চলিয়া গেল, লোকে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

আগুন জ্বলিতে জ্বলিতে ছাই হয়, আর বাতাস বহিতে বহিতে সুরভিময় হয়। গ্রামবাসীদের উত্তেজনাও ক্রমশঃ ভস্মে পরিণত হইল! কিশোর ও তাহার জননী ক্রমাগত অত্যাচারের ঘাত-প্রতিঘাতে গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। তাহারা সকলের উৎপীড়নের পাত্র হইয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্যে গর্ব্বিত হইয়া, গ্রামবাসীকে নীরব উপহাসে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

শ্রাবণ মাস। বিগত পাঁচদিন পাঁচরাত্রি ধরিয়া ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্রামপথে হাঁটুভোর জল। যত খাল ডোবা ছিল, সব জলে কানায় কানায় ভরা; ছাগল গরুও আজ পাঁচদিন যাবৎ গোয়ালে আবদ্ধ।

বেলা প্রায় দশটা। কিশোর একটা মাথালি মাথায় দিয়া গোয়াল পরিষ্কার করিতেছে, কে ডাকিল—"কিশোর, কিশোর, বাড়ীতে আছ?"

তাড়াতাড়ি ছাঁচ্‌তলার জলে হাত দু'খানি আধ-ধোয়া করিয়া শশব্যস্তে কিশোর বাহিরে আসিল। দেখিল—এক অপরিচিত ব্যক্তি। তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ; বেশ সুস্থ, সবল, দৃঢ় পেশীযুক্ত শরীর; দেহের বর্ণ শ্যাম, দাড়ি গোঁফ্ কামান—হাতে চীনাবাজারের একটা ক্যান্‌ভাস্ ব্যাগ—ব্যাগের উদরটি পরিপূর্ণ।

কিশোর সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে ডাক্‌চেন?"

আগন্তুক কহিল—"বুঝতে পেরেচি, তুমি আমায় চিন্‌তে পার নাই, তা কি ক'রে পারবে বল, আমিই কি চিন্‌তে পারি এখন? তোমার বয়স যখন চার পাঁচ বছর, তখন কেবল একবারটিমাত্র আমি তোমায়

দেখেছিলাম। আমি এখন রাজনগরে থাকি—আর বহরমপুরে এক সাহেবের কাজ করি। ছুটিও পাই না; তা ছাড়া নানা ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থাকি; ইচ্ছে কর্‌লেও আস্‌তে পারি না। আহা, আপনার লোক, হাজার হোক। দেখলেও আনন্দ হয়।"

কিশোর চতুর্দ্দশবৎসরের বালক হইলেও বিগত ছয়মাসের উৎপীড়নে সে স্বাবম্বলন এবং আত্মরক্ষায় এত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে যে, সে মধুর কৈশোরের নর্ম্মলীলা এবং অপরিমিত বিশ্বাসপ্রবণতার সীমা পার হইয়া একেবারে প্রৌঢ়ের মত সন্দেহপূর্ণ এবং বিচারক্ষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই অকস্মাৎ অপরিচিতের এই স্নেহের আহ্বানকেও সে দুষ্টলোকের চক্রান্ত না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে অসঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার নাম?"

আগন্তুক কহিল—"আমার নাম বৈদ্যনাথ মণ্ডল। তোমার বাপের অর্থাৎ রামচন্দ্রের আমি সাক্ষাৎ খুড়তুতো দাদা। আমি এখন রাজনগরে থাকি।"

উক্ত গ্রামে তাহার একজন অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যেষ্ঠতাত আছে, কিশোর ইহা জানিত। সে নতজানু হইয়া প্রণাম করিল।

বৈদ্যনাথ "বেঁচে থাক" বলিয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল; বলিল—"তোমাদের ভারি বিপদ। তাই এই দুঃসময়ে একবার খোঁজ না নিয়ে থাকতে পারলাম না। এতদিন অবিশ্যি রামু ছিল—আমার খোঁজ-খবর করার দরকারও তেমন ছিল না। আহা—" বলিতে বলিতে বৈদ্যনাথের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া সমস্ত সহানুভূতি তরল মূর্ত্তিতে অশ্রুরূপে গড়াইয়া পড়িল!

কিশোরের জননী বৈদ্যনাথকে চিনিতে পারিল না—তবুও এই দুর্দ্দশায় নিঃসম্বল বৈরিবেষ্টনের মধ্যে যে ব্যক্তি উপযাচক হইয়া শুধু একটু চক্ষের

জল ফেলিয়া যায়, সে যে আত্মীয় হইতেও পরমাত্মীয়! তাই নিতান্ত নির্ভয়ে তিনি ভাবিলেন—"হ'তে পারে, :মস্ত গুষ্ঠি, কে কোথায় আছে, তাকি আমিই সব জানি?" এই দুর্দ্দিনে দরদী কুটুম্ব লাভে মাতা-পুত্র উভয়েই খুব আশ্বস্ত হইল।

বৈদ্যনাথ হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিল। বৈঠকখানার দাওয়ায় কিশোর একখানি বড় পিঁড়ি পাতিয়া একবাটি মুড়ি ও একখানা পিতলের চিত্রিত রেকাবীতে একধারে কিছু মুড়্কি ও থান দুই গুড়ের বড় বাতাসা দিয়া জলখাবার আনিয়া দিল। তাহার পর যাহা জুটিল, তাহাই আহার করিয়া বৈদ্যনাথ বিশ্রাম করিল।

বৈকালে বৈদ্যনাথ বিদায় চাহিল, তখন বৃষ্টিটাও একটু ধরিয়াছিল; কিন্তু আকাশের রং তখনও বহুদিনের পুরাতন তুলার মত পাংশুটে। স্তরে স্তরে মেঘগুলি চারিদিক হইতে আসিয়া মাথার উপর জমাট বাঁধিতেছিল, মাঝে মাঝে অশনি গুরুগুরু রবে আলস্য ভাঙ্গিতেছিল।

কিশোর বলিল—"আজকে না গেলে হ'ত না? জল ত এখুনি এল বলে? পথে কষ্ট হবে রাত্তিরে।"

বৈদ্যনাথ বলিল—"থাকবার যো নেই বাবা—তা'লে চাক্‌রী যাবে।"

বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল। যাইবার সময় কুড়িটি টাকা দিয়া বলিয়া গেল, আপাতত এতেই যেন সে সংসার চালায়—সে মধ্যে মধ্যে আসিবে এবং তত্ত্বতালাস করিবে এবং মাসে মাসে, যতদিন না রাম ফিরে, পনরটি করিয়া টাকা দিয়া সাহায্য করিবে।

কিশোরের মাতার মনে এই আগন্তুকের সম্বন্ধের সত্যতায় প্রথমে যে একটু সন্দেহ হইয়াছিল—সেটা এখন নিঃশেষে কাটিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৈদ্যনাথ তাহার প্রতিশ্রুতিমত গত আট বৎসরকাল কিশোরদিগকে মাসিক পনের টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছে! সে মাসে মাসে একবার আসে এবং টাকা কয়টি দিয়া সংসারের সমস্ত বিধিব্যবস্থা করিয়া আবার সেইদিনই অপরাহ্নে চলিয়া যায়।

মাঘ মাস। কয়দিন হইতে শীতটা খুব জোরে পড়িয়াছে। উতলা বাতাসের একদণ্ডও বিশ্রাম ছিল না। বৈঠকখানা-ঘরের তক্তাপোষের একটি বিছানায় মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বৈদ্যনাথ শয়িত—পদতলে কিশোর জ্যেষ্ঠতাতের পদসেবা করিতে করিতে নানারকম গল্প করিতেছিল। বৈদ্যনাথ মাঝে মাঝে কেবল হু দিয়াই সারিতেছিল।

খানিকক্ষণ পরেই বৈদ্যনাথের নাসিকা-নিনাদে বুঝা গেল যে, তিনি নিদ্রার রথে আরোহণ করিয়াছেন—রথচক্র ঘর্ঘর শব্দে স্বপ্নলোকের পথে ছুটিয়াছে। কিশোরও জেঠার লেপটা একটু টানিয়া লইয়া সেইখানেই একটু গড়াইতে গিয়া তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল।

অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে একটা উচ্চ রোদনধ্বনি ও কোলাহলে কিশোরের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া কিয়ৎক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিল; ক্রমে ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে আসিল; দেখিল উঠানে একজন লোক। তাহার চুল দাড়ি খুব বড় বড়—পাকিয়া একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। এই আগন্তুকের মুখ

দেখিবামাত্র কিশোরের হৃদয়-তন্ত্রীতে একটা আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ বলিল—"আর কেঁদে কি হবে? কান্নার ত শেষ হল।"

কিশোর বুঝিতে পারিল যে, এ তাহার নির্ব্বাসিত পিতা—ফিরিয়া আসিয়াছে। সে শিশুর মত চঞ্চল হইয়া, আগ্রহে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পিতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

রামু সস্নেহে পুত্রকে উঠাইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। তপ্ত অশ্রুর অজস্র অভিষেকে পিতাপুত্রে মিলন হইল।

গ্রামে বিদ্যুতের মত রাষ্ট্র হইয়া গেল—রামচন্দ্র মণ্ডল আবার দেশে ফিরিয়াছে। প্রথমটা যে শুনিল, সেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। যাহারা পূর্ব্ব-শত্রুতা স্মরণে গৃহপ্রবেশে অনিচ্ছুক, এবং যাহারা অন্য কোনও কারণে তাহার সম্মুখে আসিতে পারিতেছিল না—তাহাদের আগমনে রামুর বাড়ীর সম্মুখের পথ হঠাৎ ভরিয়া গেল। সকলেরই সমুৎসুক দৃষ্টি আজ রামুর গৃহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

হঠাৎ দরদীদের বাহুল্যে কিশোর ও তাহার জননীও যেমন মনে মনে হাসিতেছিল, রামুও তেমনি যে একটু বিরক্ত না হইতেছিল, তাহা নহে। লোকের ভীড় কমিলে, রামু কি করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, সকলকে বলিল। তাহার কারাবাস ও পুলি-পোলাও-বাসেরও একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিল। আর সে উর্দ্ধকরে প্রণাম করিল সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জকে—কেন না তাঁহারই ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে সে এই দুই বৎসর পূর্ব্বেই মুক্তি পাইয়াছে।

একে ত' শীতের দিন দেখিতে দেখিতেই কাটিয়া যায়; তাহাতে আবার সেদিন মেঘ করিয়াছিল, সুতরাং সন্ধ্যার ক্ষুদ্র-প্রাণ, ক্ষণিকশ্রীটি

মেঘেই টিপিয়া মারিয়া ফেলিল। চৌদিকে মশক-সংঘ তিমির-সন্ধ্যার বন্দনারতি গাহিয়া উঠিল। রামু, কিশোর ও বৈদ্যনাথ তিনজনে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালাইয়া গল্প করিতেছিল।

কিশোর বলিতেছিল, তাহার জ্যেষ্ঠতাত এই বৈদ্যনাথ মণ্ডলই প্রকৃত-পক্ষে বিগত আটবৎসরকাল অত্যাচরিত, নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় সংসারটিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। জ্যেষ্ঠতাতের সাহায্যের অর্থ হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া সে এখন দুইজোড়া বলদ কিনিয়াছে, জমিজমাও কিছু বাড়াইয়াছে, ঘরে চাষ সুরু করিয়াছে, গর্ত্তটার মাটি তোলাইয়া পুকুরের মত করিয়াছে, এবার আবার তাহাতে কিছু ভাল পোনাও ছাড়িয়াছে, ইত্যাদি।

রামু বৈদ্যনাথকে চিনিতে না পারিলেও অসীম কৃতজ্ঞতায় এই পরিচয়-হীন আত্মীয়টীর প্রতি সমস্ত মনে প্রাণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। বিপুল ভাবাবেশে সে বৈদ্যনাথের মুখপানে চাহিতেই পারিতেছিল না।

রামু বলিল—"আমার যে এমন দাদা ছিলেন, তা' যদি আমি জান্‌তাম —তাহ'লে কি কিছু কষ্ট পেতে হত? আমি নিজের দুঃখে একদিনও কাতর হই নাই, কেবল তোমাদের যে কী ভাবে রেখে গেচি, এই চিন্তাই আমায় পাগল করে তুল্‌ত। তোমাদের এমন অবস্থায় দেখ্‌ব জান্‌লে আমার যে অপরাধ নেই, এই কথাটা আমি যেমন বুক-জুড়ে বসিয়েছিলাম —তেমনি সকল দুঃখ জয় করে' সুখেই দিন কাটাতে পারতাম।"

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। এ মৌন, কথার সমাপ্তিতে নয়, পর্য্যাপ্তিতে। কথা যখন আকণ্ঠ, কণ্ঠ তখন আপনিই রুদ্ধ হইয়া আসে।

রামুই পুনরায় কথা আরম্ভ করিল। হাত কচলাইতে কচলাইতে ভূমিসন্নত-দৃষ্টিতে, পাছে বেদনা দেওয়া হয়, এইরূপ শঙ্কা ও সঙ্কোচের

স্বরে রামু বলিল—"দাদা, কিছু যদি মনে না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

বৈদ্যনাথ স্বাভাবিক অচঞ্চল স্বরে বলিল—"কি বলচ ভাই?"

"আপনাকে আমি ঠিক চিন্‌তে পারচি নে। হরিকাকার এক ছেলে —তার নাম ত শরৎ! সে জন্মাবধি তার মামার বাড়ী রাজনগরেই থাকে, জানি। তার পরে, তাকেও আমি কতবার দেখেচি—তাছাড়া সে ত চাষ-বাস করে, কোনও সাহেব-টাহেবের চাক্‌রী ত সে করে না!"

বৈদ্যনাথ প্রথমটা একটু হাসিল। সেই ক্ষীণালোকেই দেখা গেল যে, তাহার মুখমণ্ডলে লজ্জার একটা রক্তিম-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একটু হাসিয়া, একটু কাসিয়া, বৈদ্যনাথ গলাটা ঝাড়িয়া লইল। রামু উত্তরের প্রতীক্ষায় বৈদ্যনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিশোর একটু নড়িয়া-চড়িয়া নিকটে সরিয়া বসিল।

বৈদ্যনাথ ধীরে ধীরে বলিল—"চিন্‌তে না পার্‌বারই কথা বটে! আমিই কি তোমায় চিন্‌তাম? সন্ধান করে' নিলাম। তুমি এই খুন-ডাকাতিতে যখন গ্রেপ্তার হলে শুন্‌লাম—তখন প্রথমটা বেশ স্ফূর্ত্তি হলো। ভাবলাম যা' শত্রু পরে পরে', ভালই হলো। কিন্তু দু'এক দিন যেতে না যেতেই আমার মনটা যেন কেমন কর্‌তে লাগল। এমন আমার আর কখনও হয় নাই।

"হাঁ, আমার নাম মোটেই বৈদ্যনাথ নয়—আমার নাম বিশ্বেশ্বর। মাঝের গাঁয়ের ও কাণ্ডটা আমারি করা। যতই প্রমাণ হোক্—যে যাই বলুক, আমি জানি তোমার কোনো দোষ নেই।

"হঠাৎ আমার মনে হল যে, দোষ কর্‌লাম আমি, আর সাজা

পাবে, যে একেবারে কিছুই জানে না? এই কথাটা আমার পাঁজরার মধ্যে এমন করে বিঁধে গেল যে, আমার আর কোনো কিছু ভাল লাগ্‌ল না। ভাবলাম, নিজেই গিয়ে ধরা দিই এবং সমস্ত কথা খুলে বলে' তোমায় ছাড়িয়ে আনি। কিন্তু সেটা সাহসে কুলোল না; কারণ, পনের কুড়ি বৎসরকাল এই সব করতে কর্‌তে ভেতরটা যেন কী রকম হয়ে গেছে।

"হাঁ, যা বল্‌ছিলাম। নিজেকে ধরিয়ে দিতে যখন সাহস হলো না—তখন তোমাকে যাতে রক্ষা করতে পারি, এই হলো আমার প্রধান ভাবনা। —রেতে ঘুম নেই; যদি একটু চোখটা এঁটে আসে, অমনি ভয় দেখে জেগে উঠি; পেটে ক্ষিদে থাকে, গলা দিয়ে ভাত নামে না; কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতেও ভাল লাগে না; আবার একাও থাক্‌তে পারি না। এ কি ভয়ানক যন্ত্রনা বল দেখি! এর চেয়ে ধরা পড়া অনেক ভাল ছিল! সব চেয়ে সেইটেই ভাই বড় কষ্ট, যে কষ্টের কথা কাউকে প্রকাশ করে বল্‌বার যো নেই।

"তুষের আগুন ভিতর ভিতর ধিকিধিকি জ্বলে—তাকে থাবড়ে নেবাতে গেলে সে যেমন ছড়িয়েই পড়ে—আমার দশাও ঠিক তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"জেলায় গেলাম। খুব বড় যে সব উকীল, তাদের দু'জনকে তোমার দিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চুপে চুপে মকদ্দমার তদ্বির কর্‌তে থাক্‌লাম। তাতে কতকটা আরাম পেলাম।

"কিন্তু তোমার অদৃষ্টে ভোগ আছে, কে খণ্ডাবে? রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না যখন, তখন ভাবলাম—তোমার শাস্তি আমার কেন হ'ল

না! আবার সেই ভাব জেগে উঠ্‌লো! সময় সময় ইচ্ছে হতো নিজের গলা নিজে টিপে মেরে ফেলি—কোনও রকমে মরে' এ যাতনার শেষ করি। কিন্তু আবার ভাবলাম ম'রে লাভ কি? বরং তুমি না-ফেরা পর্য্যন্ত তোমার সংসারের সেবা করে একটু প্রায়শ্চিত্ত করি।

"এখানে ফাঁকিটা খুব ভালই দিলাম, উপরে ত দেবার যো নেই ভাই—" বলিতে বলিতে সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্তম্ভিত-চেতনায়, নিরুদ্ধশ্বাসে পিতাপুত্রে দস্যুর এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, যে, কখন যে কেরোসিনের ডিবিটা নিবিয়া গিয়াছিল, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য হয় নাই।

অন্ধকারে মুখ দেখা গেল না। রামচন্দ্র গদ্‌গদ স্বরে ডাকিল—"দাদা, দাদা!—"

দূরে সরকারী রাস্তার উপর দিয়া কিনু পাগলা তখন গাহিয়া যাইতেছিল—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে—এ,
আমি আর বাইতি পার্‌লাম না।"

বিপত্নীক

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

বয়স যাহাই হউক না কেন, স্ত্রী-বিয়োগের পর সকলেই একবার করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে—আর বিবাহ করিব না। শেষ পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে শতকরা একজন, বাকী নিরানব্বুই জন করে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম। ব্রজকিশোর বাবুও এই প্রথানুযায়ী প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে, তিনি দ্বিতীয় বার আর দারপরিগ্রহ করিবেন না, কোন মতেই না। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

অল্পবুদ্ধি লোকেরা সমবেদনা জানাইয়া, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর দ্বিতী দিবস হইতেই বিবাহের জন্য ব্রজবাবুকে ভীষণভাবে ধরিল তিনিও খুব জোরের সহিত সে সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যা করিলেন। গ্রামে মহাসমারোহে স্ত্রীর শ্রাদ্ধ করি লেন। একা পুষ্করিণী খনন করাইয়া, স্ত্রীর নামানুযায়ী সেই জল শয়ের নামকর করিলেন—গোলাপপুকুর। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল, গো লাপসুন্দরী।

কুকুনপুরের জমিদার, নিঃসন্তান, ব্রজকিশোর ত লদার কুলীন ব্রাহ্মণ-বয়সও এমন কিছু অধিক হয় নাই, এই মাত্র ৪০।৪২ ; সুতরাং রক্ষণী অরক্ষণীয়া বয়স্থা অবয়স্থা গৌরী কিশোরী য বতী অবিবাহিতা কন্যাগ

পিতৃমহলে একটি বিশেষ রকম সোরগোল পড়িয়া গেল। জমিদারবাবুর গৃহ নিত্য দুই-দশজন ভাবী শ্বশুরের আবির্ভাবে সরগরম হইয়া উঠিল। যত দিন যায়, শ্বশুর-সংখ্যা ততই বাড়িয়া চলে। ক্রমশঃ দেশের আশপাশ গ্রাম নগর ছাড়িয়া মহকুমা মায় জেলা সদর হইতেও উক্ত আত্মীয়গণ ধাওয়া করিতে লাগিলেন।

প্রত্যেকে বলেন যে, তাঁর কন্যা অতি সুলক্ষণা, সুন্দরী, কর্ম্মিষ্ঠা ও গুণবতী। কেহ কেহ জানাইলেন যে, জ্যোতিষীর গণনাফল মতে তিনি ব্রজবাবুর কাছে আসিয়াছেন; কারণ তাঁহার কন্যার রাজরাণী হওয়ার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা। ব্রজবাবু এই সমস্ত হইলে-হইতে-পারে শ্বশুরবর্গের নিকট, নিজের এত গুণাবলীর সন্ধান পাইলেন যে, নিজের সম্বন্ধে অধিকাংশ বিষয়ই তিনি আর কখনও জানিবার সুযোগ পান নাই! আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হইয়া, প্রকাশ্য বিজয়ে তিনি সকলকেই মিষ্টমুখে জানাইলেন যে, বিবাহ তিনি আর করিবেন না; অনর্থক তাঁহারা কষ্ট করিয়া এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে না পারায় তিনি আন্তরিক দুঃখিত ইত্যাদি। সকলেই এই তথ্য অবগত হইয়া নিরাশ হৃদয়ে বিদায় হইতে লাগিল।

দুই একজন গ্রামস্থ ভদ্রলোক ব্রজবাবুকে ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাই ত', এমন এষ্টেটটা নষ্ট হবে?"

ব্রজবাবু সখেদে উত্তর দিলেন—"ভগবানের ইচ্ছাই তাই, বেশ বোঝা যাচ্ছে—সেই জন্যেই আমার সন্তানও হয় নাই।"

মধুসূদন বাবু অবসর-প্রাপ্ত দারোগা; তিনি বলিলেন —"এই জন্যেই বোধ হয়, আপনার আর একবার সংসার করা প্রয়োজন।"

ব্রজবাবু বলিলেন—"যদি তাঁরও সন্তান না হয়? কিম্বা বিবাহের পর দিনই যদি আমি মারা যাই? তা'হলে কি হবে, মধুদাদা?"

মধুসূদন নীরব রহিলেন। ব্রজবাবু আত্মপ্রসন্ন ভাবে কহিলেন—"এতেই বোঝ', ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কায করে' তাঁর বিধিলিপি খণ্ডাবার চেষ্টা নিছক ক্ষ্যাপামি।"

গ্রামের আর কেউই বড় একটা কিছু বলিত না। দূরাগত শ্বশুর-গণও ক্রমশঃ বিরল হইলেন; কারণ, ভরসার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না। দেশের লোকে স্থির করিল, ব্রজবাবু আর কোনও মতেই বিবাহ করিবেন না। জমিদারীর কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

গুজব উঠিল, তিনি পোষ্যপুত্র লইবেন—তবে কাহাকে, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। গ্রামের মেয়ে এবং পুরুষ এক বাক্যে বলিতে লাগিল—"পুরুষ বটে! কী পিতিজ্ঞে! কম সম্বন্ধটা ফেরালে? এতগুলো বিয়ের সম্বন্ধ যে ফেরাতে পারে, সে মহাপুরুষ!"

ব্রজবাবু স্ত্রীর শোকে পাগল। মন স্থির করিতে তীর্থ-পর্য্যটনে যাইবেন। সঙ্গে যাইবে কেবল রঘু খানসামা—আর কেউ নয়।

শুভ দিন, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ব্রজবাবু যাত্রা করিলেন। গ্রামের লোকে সত্যই বিষণ্ণ হইল—কারণ, ব্রজবাবু ছিলেন পরোপকারী, নিরীহ, ভালমানুষ ও দয়াবান জমিদার—জমিদার-বংশে সচরাচর যে কয়টি গুণ একেবারেই বিরল! কাজেই প্রজাবর্গ তাঁহাকে বাস্তবিকই ভালবাসিত ও আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছয় মাস অতীত হইয়াছে! ভারতের নানা তীর্থ ও অতীর্থ স্থান তিনি ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু মনে কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। একটা কিসের অভাব, কী যেন নাই—সমস্ত জীবনটাকে দিন দিন বিষাক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

বড়ই নিঃসঙ্গ। সঙ্গী চাই। পল্লীগ্রাম ভাল লাগিল না। মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, দেশে একা থাকার চেয়ে এই বিরাট মহানগরী কলিকাতায় বাস করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। কারণ, মন-ভুলানোর সব উপকরণই এখানে প্রচুর এবং অজস্র। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে গিয়া দেখিলেন যে, শুধু মনের নয়, রসনার উৎকর্ষ সাধনের পক্ষেও কলিকাতা অতি প্রশস্ত স্থান। চাই শুধু অর্থ,—তাহা তাঁর যথেষ্টই আছে,—আর তিনি একাই সে সমস্তর মালিক।

একটী আশ্রমে তিনি উঠিয়াছিলেন। রাত্রে আহারাদির পর অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার জীবন চিরকাল পল্লীগ্রামে অতি কষ্টেই কাটিয়াছে! প্রকৃত সুখ ভোগ তিনি কখনই করেন নাই। অথচ অর্থাভাবে নয়,—অর্থ যথেষ্টই আছে। আর, কাহার জন্যই বা সঞ্চয়, ভোগ করিবে কে? নিজে কষ্ট সহিয়া আর জমাইবেনই বা কাহার জন্য? তাঁহার সব গিয়াছে। আর কোনো আশা নাই। নিজে বরং যে কয় দিন বাঁচেন, ভোগ করিবেন···তাঁহার নিজের টাকা, তিনি

নিজের জন্য ব্যয় করিবেন—তাহাতে আর চক্ষুলজ্জা কিসের? মনে মনে স্থির করিলেন, জীবনের বাকী কয়টা দিন এই কলিকাতাতেই বাস করিব। আর এই ত' স্থান,—কালী আছেন, গঙ্গা আছেন। হিন্দুর তো এই শেষ কামনা। কলিকাতা মহাতীর্থ।

তিন চারি দিনের মধ্যেই ভৈরব বিশ্বাসের গলিতে ব্রজবাবু একটি ছোট দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই আবশ্যক মত খাট, টেবিল, চেয়ার, কৌচ, আলমারী হইতে ছবি পর্দ্দা পর্য্যন্ত আনাইয়া বাড়ীখানি মনের মত করিয়া সাজাইয়া ফেলিলেন। একখানি শ্রীমদ্ভাগবতগীতাও ক্রয় করিলেন।

সকাল-সন্ধ্যা হেদোর ধারে পাদচারণা করেন, দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া কিয়ৎক্ষণ গীতা পাঠ করেন, এবং রাত্রে প্রায়ই থিয়েটার বা বায়োস্কোপ দেখেন।

এইরূপ নিদারুণ নিয়ম ও কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ব্রজকিশোর বাবু দুই তিন মাসের মধ্যেই আশাতীত সুফল পাইলেন। মৃতা পত্নীর স্মৃতি আর তাঁহাকে বড় একটা ব্যথিত করিয়া তুলে না। তাঁহার স্ত্রীর মুখও ক্রমে ক্রমে দূরাভিগত পদার্থের মত ঝাপ্‌সা ও অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমশঃ স্ত্রীর কথাও স্মরণ-বিরল হইয়া আসিল। তাঁহাকে মনে করিয়া মনে করিতে হইত। এটা যে তীর্থ-মাহাত্ম্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বৈশাখ মাস। খুবই গরম। হেদোর বেঞ্চে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া বাড়ী ফিরিয়া ব্রজকিশোর বাবু আহারাদি সারিয়া, ছাদে আসিয়া বসলেন। সম্মুখের বাড়ীতে এক মাড়োয়ারী বাস করিত; তাহার

রাস্তার ধারের ঘর হইতে আলোকচ্ছটা, হাস্যকলরব ও রমণীকণ্ঠে মধুর গান শোনা যাইতেছিল। ব্রজবাবু গান শুনিতে শুনিতে মোহিত হইয়া গেলেন।

খোলা জানালার ফাঁক দিয়া সমুজ্জ্বল কক্ষের মধ্যে দেখিলেন—একটি বাঙ্গালী যুবতী। তাহার বয়স প্রায় বিশ বৎসর; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; আগাগোড়া চক্‌চকে সোণার গহনায় মোড়া; পরণে একখানি সিল্কের নীল শাড়ী—নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে হাসিয়া হাসিয়া, ঢলিয়া ঢলিয়া, গান গাহিতেছে। গান হইয়া গেলে, অন্য গান ধরিবার অবকাশ সময়টুকু উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতেছে।

ব্রজবাবু এক দৃষ্টে নির্ণিমেষ নয়নে কক্ষমধ্যে চাহিয়া রহিলেন। ওদিকে গড়্‌গড়ায় তাওয়া-দেওয়া তামাক কোন্ কালে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল—সে কথা একবার মনেও হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তীর্থ-মাহাত্ম্য যদি না থাকিবে, আজ পর্য্যন্ত তীর্থস্থান সমূহের তবে এত আদর কেন? সুতরাং ব্রজকিশোর বাবুরও মা গঙ্গা ও কালীর কৃপায় অতি শীঘ্রই আশাতীত সুফল ফলিল। পত্নীবিয়োগজনিত যে দুঃসহ বেদনায় তিনি এই তীর্থবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে বেদনা এখন আর নাই বলিলেও চলে। এখন নব নব বন্ধুর সখে, নিত্য নূতন আনন্দে তাঁহার দিনগুলি শরতের লঘুমেঘখণ্ডের মত নিশ্চিন্ত আলস্যে অতিবাহিত হইতেছিল।

পয়লা আষাঢ়। অতি প্রত্যুষেই, ব্রজবাবু কেবল মুখ ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়, নরেনবাবু খট্ খট্ করিয়া একেবারে ব্রজবাবুর উপরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত।

ব্রজবাবু অসময়ে বন্ধুবরকে দেখিয়া যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আরে নরেনবাবু যে! এখন?" পরে সুর করিয়া—

"বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?"

নরেনবাবুও হটিবার পাত্র নহেন। তিনিও সসুরে উত্তর দিলেন—

"আজ তোমারে দেখ্‌তে এলাম অনেক দিনের পর—"

ব্রজবাবু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"বেশ বেশ, বসুন্ বসুন্—বস্‌তে আজ্ঞা হয়। ওরে রঘু, নরেনবাবুকে চা দে'। তার পর খবর কি?"

নরেনবাবু অভিনয়-ভঙ্গীতে বলিলেন—"একে একে খুঁজিলাম সমগ্র ভারত, ইন্দিরার না হ'ল সন্ধান!

অনেক খোঁজ কর্‌লুম, ব্রজবাবু, আপনার প্রেয়সীর সন্ধান কিন্তু পেলুম না।"

ব্রজবাবু বলিলেন—"না, না, কী বলেন নরেনবাবু, প্রেয়সী শ্রেয়সী নয়—আমি বিদেশী লোক, তাতে বুড়ো মানুষ—আমার কি আর—"

নরেন বাধা দিয়া বলিল—"আরে আমি কি আর তাই বল্‌চি? তবে বিদেশী আপনিও যেমন, আমিও তেমনি—আর সে-ও যে এখানকার নেদী বাসিন্দা, তাও নয়। এ সব কলকাতার ফজ্‌লী আম আর কি?"

ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন। রঘু দুই পেয়ালায় চা ও দু'খানি প্লেটে কয়েকখানি করিয়া গরম লুচি ও আলু ভাজা উভয়ের সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া চলিয়া গেল।

নরেন খাইতে খাইতে বলিল—"যাক্‌ বাজে কথা। আপনার গান শোন্‌বার যদি সখ হয়ে থাকে, তবে সে ছাড়া কি এই কল্‌কাতা সহরে আর কেউ গাইতে পারে না, মনে করেন আপনি? আমি অবিশ্যি তার গান শুনিনি, কিন্তু এটা হলফ্‌ করে' বল্‌তে পারি যে, তার চাইতে ঢের ঢের ভাল গাইয়ে আছে, যাদের গান আপনি যে-কোনো দিন ইচ্ছা করলেই শুনতে পারেন।"

ব্রজবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া, তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"তা তো বটে, তা তো ঠিক,—তবে—"

"তবে,—তবে কি?"

"এই ভদ্রপল্লী, লোকে একটু সম্মান করে, বয়সও হয়েচে, বাড়ীতে চাকর বাকর আছে—এরা কি মনে ভাব্‌বে ?"

নরেন কহিল,—"এই কথা ? হেঃ, আপনিও যেমন। বাড়ীতেই আন্‌তে হবে, তার মানে কি ? তাদের বাড়ীও তো যাওয়া যায়।"

ব্রজবাবুর এই নূতন কলিকাতা বাস। তিনি শুনিয়াছেন এবং বাঙ্গলা সাপ্তাহিকে পড়িয়াছেন যে, উক্ত পল্লীতে সহরের বিখ্যাত গুণ্ডা, চোর, খুনে, পকেট-কাটাদের আড্ডা। ওদিকে যাতায়াত করিলে প্রাণ সংশয় অনিবার্য্য। কাজেই তিনি বাড়ীতে বসিয়া নিরাপদে গান শুনিয়া চরিতার্থ হইতে চাহেন, অথচ মুখ ফুটিয়া এ আশঙ্কার কথা নরেনকে বলিতেও পারিতেছেন না—পাছে সে কি মনে করে!

ব্রজবাবুকে চিন্তিত দেখিয়া, নরেন্ কহিল—"কী, চিন্তিত হয়ে পড়্‌লেন যে! ওদের বাড়ী গেলে জাত যাবে না কি ? না, মানের হানি হবে ?"

ব্রজবাবু লজ্জিত ভাবে উত্তর দিলেন—"আরে রামঃ, জাত কি যাবে ? এই কলিযুগে কি আর কারও জাত-টাত আছে, যে যাবে ? আর এই কলিকাতা সহরে, আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর মান কী, যে হানি হবে ? ও সব কথা ভাব্‌চি না। ভাব্‌চি—লোকে—"

নরেন বাধা দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল,—"লোকে কি বল্‌বে ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এ কলিকাতা মহানগরী, কে কার খোঁজ রাখে ? আপনি কখনও—বিশেষতঃ রাত্রে—রামবাগান, সোনাগাছি, মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, হাড়কাটা কি চিৎপুর গেছেন ?"

ব্রজবাবু কবুল জবাব দিলেন—"না নরেনবাবু, আমি কখনও দেখি

নাই। ও দিকে যাই নাই। তার কারণ সঙ্গী পাই নাই—এবং একলা যেতেও সাহসে কুলোয় না।”

নরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই কথা! আচ্ছা, আপনাকে আজ আমি নিয়ে যাব, মোটামুটি একবার দেখিয়ে আপনার ভয় ভাঙ্গিয়ে আন্‌ব। আজ শুভদিন, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে—”

ব্রজবাবু “হাঁ” বলিবেন, কি “না” বলিবেন বুঝিতে পারিলেন না—চুপ করিয়া রহিলেন। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা স্পন্দন অনুভব করিলেন—অথচ, যাইতে যে, অনিচ্ছা—তাহাও নয়।

নরেন ঘাগী। এ কার্য্যে তাহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি। সে বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে। আর এ প্রসঙ্গ উত্থাপনই করিল না, কি জানি পাকা গুটি যদি হঠাৎ কাঁচিয়াই যায়!

“কী বিশ্রী গরম পড়েচে, দেখেচেন? সে দিন কাগজে পড়লুম—১৮৬৫ সালের পর এরকম গরম কলিকাতায় আর কখনও হয় নাই।”

ব্রজবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বলেন কি? ১৮৬৫ সালে এমনি গরম পড়েছিল, আর এবার?”

নরেন বলিল—“হাঁ। এই দেখুন না, মোটে ত’ আটটা বেজেচে, এরই মধ্যে কি রকম ব্যাপার। আজ পয়লা আষাঢ়—জলের নামগন্ধ পর্য্যন্ত নেই। যাই এখন তা’হলে, আবার মেসে গিয়ে হয় ত নাইবার জল পাব’ না, যেতেও তো হবে অনেকটা!” নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজবাবুও দাঁড়াইলেন, বলিলেন—“যাবেন? অফিস আছে বুঝি?”

নরেন বিকৃত মুখ-ভঙ্গীতে উত্তর দিল—“ঐ একটা জিনিষেই জীবনটা মাটি করে দিলে, ব্রজবাবু—তা’হলে চল্লুম, নমস্কার।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রজবাবু অতিথিকে বিদায় দিতে দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। নরেন প নামিল, অথচ সে সম্বন্ধে আর কিছুই বলিল না দেখিয়া,—ব্রজবাবু নরেন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা'হলে বিকেলে আস্‌চেন ত? অ বেরুব না, আপনার জন্য অপেক্ষা করব।"।

নরেন এইটিই আন্দাজ করিয়াছিল। সে প্রীত ভাবে, চলি চলিতেই, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"যথা ইচ্ছা তব মহারাজ!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সারাদিন ব্রজবাবুর মনটা ছিল বড়ই উত্তেজিত, কারণ জীবনে তিনি টা নূতন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কতক আনন্দে, কতক সাদে,—কিছু সাহসে কিছু আশঙ্কায়—এক পা আগাইয়া, দুই পা ছাইয়া—সকাল হইতেই তাঁহার মনটি কেবলি আলো-অন্ধকারের দোলায় দুলিতেছিল। মাথাটা এত উত্তপ্ত হইয়াছিল যে, অনেক চেষ্টা রয়াও তিনি তাঁহার আজন্ম-অভ্যস্ত দিবানিদ্রাটিকে সেদিন আর ঘটস্থ রিতে পারিলেন না।

বাবুকে বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিয়া, এবং তাঁহার ভৈরব সিকাগর্জ্জন না শুনিয়া ভৃত্যেরা ভাবিল, "কলিক্" (শূল) ব্যথার মত র হয়ত পত্নীবিরহ চাগিয়াছে। বাবু ভাবিলেন, অত্যন্ত গরম, ং অন্তর্যামী ভাবিলেন, অন্য একটা।

বেলা তিনটার সময় ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া তিনি ক্ষৌর কার্য্যে প্রবৃত্ত লেন। রঘু খানসামা স্নানের ঘরে কাপড় তোয়ালে রাখিয়া গেল। বাক্স খুলিয়া একখানি কালাপেড়ে ফরাসডাঙ্গার ধুতি বাহির করিয়া বলিলেন—"ও থানখানা রেখে, এইখানা কুঁচিয়ে দে।" ভৃত্য দেশ পালন করিতে গেল।

স্নানাদির পর পোষাক পরিতে যাইয়া মহামুস্কিল ঘটিল। কী পরিলে মানায়, অথচ বাবুগিরিও প্রকাশ পায়। অনেক চিন্তা-বিবেচনা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

করিয়া শেষে না-হু-মনেই একটা স্থির করিয়া, ফরাসডাঙ্গাই প

ফেলিলেন।

নীচে সূতার গেঞ্জীর একটা ড্রয়ার, তার উপর কোঁচান কালো প ফরাসডাঙ্গার ধুতি; গায়ে সিল্কের শার্ট, তাহাতে মোটা মোটা চক্‌চ .সোনার বোতাম আঁটা; তার উপর বুক-খোলা ইংরাজী ছাঁটের গর কোট; গলায় শক্ত চক্‌চকে উঁচু কলার; পকেটে সোনার ঘড়ি মোটা সোনার চেন; হীরা-বসান, লকেটখানা নাতিউচ্চ ভুঁড়ি উপর দুলিয়া দুলিয়া কিরণ বিকীরণ করিতে লাগিল। সিল্কের পাড় ব রুমালখানি পকেট হইতে ঈষৎ বহিষ্কৃত, সেখানি বিলাতী এসেন্সে সুগি পায়ে গার্টারে আঁটা বাদামী রঙের একজোড়া জাপানী সিল্কের মে ও গ্রীজারভার; পদতলে একজোড়া নূতন ঝক্‌ঝকে পম্প। দুই হা দশ আঙ্গুলে চারিটি চার রকমের আংটি, চক্ষে সোনার চশমা। হ সোনা দিয়া মুখমোড়া মোটা বেতের একগাছি ছড়ি; সর্ব্বোপরি গ একখানি কোঁচান চাদর। পার্‌সে খান আষ্টেক দশ টাকার (ভরিয়া কোটের বাম দিকস্থ ভিতর পকেটে রাখিয়া, তিনি প্রা গাত্র-বিলম্বিত বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার প্রতিকৃতি সাজ দেখিতে লাগিলেন। ঘাড় বাঁকাইয়া, সম্মুখে পশ্চাতে হেলিয়া, ম ঝাকাইয়া, হাত নাড়িয়া ছুড়িয়া ঝাড়িয়া, ঈষৎ হাসি হাসিয়া, উচ্চ করিয়া, হাঁ করিয়া, কেমন দেখায় সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া ল বিলম্বে অধীর হইয়া একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একখানি চেয়ারে ব সাবধানে এবং সন্তর্পণে গিয়া বসিলেন—চক্ষু দুটি জানালার বাহিরে প পানে কাহাকে ব্যাকুল ভাবে খুঁজিতে লাগিল। বেলা প্রায় ছয়ট

এখনও কলিকাতার আকাশ-ভরা রৌদ্র। বসিয়া বসিয়া ব্রজবাবু ঘামিতে লাগিলেন ও নরেনের উপর বিরক্ত হইতে লাগিলেন। এত দেরী কিসের? কাপড় চোপড় যে সব নষ্ট হইয়া গেল!

রঘু আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। ব্রজবাবু বিলক্ষণ বিরক্তিপূর্ণস্বরে, ঝাঁজের সহিত হুকুম দিলেন—"নিয়ে আয় আমার চা আর খাবার। তারপর নরেনবাবু যখন আস্‌বেন, তখন তাঁকে দিস্।" রঘু চলিয়া গেল।

এমন সাজিয়া গুজিয়া কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়? এক একবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, এ অপেক্ষা করা অসহ্য! সব খুলিয়া ফেলা যাউক—আর যাইবেন না। বুঝুক নরেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিয়া লজ্জিত হইয়া ঠিক করেন—তা-ও কি হয়? নরেন আমায় তাহলে ঠাওরাবে কী? হয় নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে, নয় নিতান্ত ভীতু, কৃপণ। অতএব যাইতেই হইবে। নরেন বুঝুক—আমি কত বড় লোক, কত সৌখীন্, কত খরচে! আমি তো আর কোনও অন্যায় কায করতে যাচ্ছিনা—যাচ্ছি, সময় কাটে না, একটু গান শুন্‌তে মাত্র। শাস্ত্রে বলে—নো বিদ্যেং সঙ্গীতং পরং!—

"আজি এসেছি এসেছি এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি রূপ গান—"

গাহিতে গাহিতে নরেন্দ্রনাথ একেবারে কক্ষমধ্যে আবির্ভূত। ব্রজবাবুর ধড়ে প্রাণ আসিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এত দেরী যে? কোন্ কাল থেকে আমি বসে বসে শেষে এই মাত্র চা' খেয়ে ফেল্‌লাম।"

নরেন একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল—"মশায়, নানান্ কাযে আমরা

থাকি। আমরা তো আর জমিদার নই; যে ভাবনা চিন্তে নাই—খাজনা আসচে। আমাদের খেটে খেতে হয়।”

ব্রজবাবু মনে মনে পরম উৎফুল্ল হইয়া, মুখে আড়ষ্টভাবে কেবল ‘হেঁ হেঁ’ করিলেন মাত্র—কিছু বলিতে পারিলেন না।

রঘু ইত্যবসরে চা দিয়া গিয়াছিল। নরেন তাড়াতাড়ি চা পান শেষ করিয়া কহিল, “তাহলে গাত্র উৎপাটন করুন্।”

“হাঁ, চলুন” বলিয়া ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইতেই, টেবিলের কোণে তাঁহার কোটের পকেট আটকাইয়া গিয়া ঈষৎ বাধা লাগিল—তিনি তাহা লক্ষ্যও করিলেন না। মনে মনে বলিলেন—দুর্গা শ্রীহরি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রামবাগানের মাঠে নামিয়া ট্যাক্সিকে বিদায় দিয়া উভয়ে একবার সমস্ত মহল্লাটি পদব্রজে ঘুরিয়া লইলেন। নরেনের উদ্দেশ্য—ব্রজবাবুকে এ পল্লীটি একবার দেখান। রামবাগান, গরাণহাটা, সোনাগাছি, শেঠের বাগান, চিৎপুরের বড় ব্যারাক ঘুরিয়া নরেন ব্রজবাবুকে লইয়া পুনরায় রামবাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ব্রজবাবুর বুকটা অকারণ আশঙ্কায় যদিও দুরু দুরু করিতেছিল, তথাপি তাঁহার ভালই লাগিতেছিল। তিনি বিস্মিত হইয়া কেবল এদিক-ওদিক, উপরে-নীচে চাহিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে রিক্স, মোটর, ট্যাক্সি, গাড়ীর ভীড় জমিয়া উঠিতে লাগিল। ছোট সরু পথ—লোকের যাতায়াতে গিশ্ গিশ করিতেছিল। অথচ কেহই কাহারও সঙ্গে আলাপ করে না। কাহারও কোনরূপ সঙ্কোচও নাই। কেহ কোনও গৃহে প্রবেশ করিতেছে কেহ বাহির হইতেছে, কেহ পথে দাঁড়াইয়া দ্বিতলস্থা কোনও নারীর সঙ্গে আলাপ করিতেছে, কেহ পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মানা কাহারও সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছে—কেহ কাহাকেও ডাকিতেছে। সর্ব্বত্র এইরূপ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দেখিয়া ব্রজবাবুর জড়তা অনেকটা কাটিয়া গেল।

ঘরে ঘরে হার্ম্মোনিয়ম সংযোগে গীত বাদ্যের ফোয়ারা, মধ্যে মধ্যে বিলাসীদের 'হাঃ হাঃ' 'বাহবা' প্রভৃতি নানা সরস চাটনি, কক্ষ সমূহ হইতে বিচ্ছুরিত দীপশিখা—সমগ্র পল্লীটিকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে।

ব্রজবাবু এদিকে জীবনে কখনও আসেন নাই, তাঁহার চিত্তে এক অপরূপ মায়ারাজ্য সৃষ্টি করিয়া তুলিল!

ব্রজবাবুর মনখানি একটা অজ্ঞাত অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলকাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বাহিরে যার এত সমারোহ, ভিতরে না জানি তার আরও কত কি আছে! এতদূর আসিয়া কি আর ফেরা যায়? ভিতরে যাইতেই হইবে। দেখিতে হইবে এরা কেমন! বিশেষতঃ এমন সঙ্গী যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন একবার দেখিয়াই লওয়া যাউক না কেন? দোষ কি?

মনের মধ্যে কে উঁকি দিয়া বারংবার বারণ করিতেছিল। ব্রজবাবু স্থির করিলেন—একটা কুসংস্কার মাত্র। আমি তো অন্যায় কিছু করিতে যাইতেছি না—কেবল একটু গান শুনিব মাত্র, ইহাতে কোনো দোষ নাই!

এমন সময় নরেন মুখের কাছে মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোনো ঘরে গিয়ে গান টান শুনবেন ত'? এই বেলা চলুন তবে, নৈলে সব ঘরে লোক এসে যাবে এখুনি!"

ব্রজবাবু ঢিল-ছোঁড়ার মত চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "হাঁ, চলুন্!" কথা কয়টি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিয়া, ব্রজবাবু যুগপৎ আশ্বস্ত ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আর ফিরানো যায় না। নরেনের পিছু পিছু তিনিও মন্ত্র-মুগ্ধের মত চলিতে লাগিলেন।

মাঠের পশ্চিমে ছোট্ট দ্বিতল একখানি বাড়ী। প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ পাশেই, উপরে উঠিবার সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখটা অন্ধকার, মধ্যে বাঁকের কাছে একটা কেরোসিনের দেওয়াল্‌গিরি জ্বলিতেছিল। দুপ্ দুপ্ করিয়া

নরেন দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া আসিল। ব্রজবাবু অনভ্যস্ত সিঁড়িতে আস্তে আস্তে উঠিতেছিলেন।

নরেন উপরের উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"কৈরে বুড়ী?"

পদশব্দে ও কণ্ঠস্বরে ভৃত্য রামচরণ আসিয়া নরেনকে দেখিয়াই, পাশের ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—"নরেন বাবু আসেছে মা!"

কক্ষমধ্য হইতে স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠে কে আজ্ঞা দিল—"এই ঘরে ডাক্।" স্বর রুক্ষ, পরুষ ও কর্কশ। নরেন শুনিয়াই ব্রজবাবুকে সেইখানে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া, সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রামচরণও নরেনের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ লাখ কোকিলের গিট্‌কিরীর মত সিঁড়িতে "মা, ও মা, বাতি দেখাও না, যাব কি করে?" বলিয়া আব্দারের সুরে কাহার সুমধুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "এস বাবা এস, বাতি ত রয়েচে মা" বলিয়া রমণী উঠিল। কন্যা অনুযোগের সুরে বলিল—"বাতি তো রয়েচে, তোমার মাথা রয়েচে আর মুণ্ডু রয়েচে—"

উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, নিটোল স্বাস্থ্য, নাতিদীর্ঘদেহা, সুবেশা, সালঙ্কারা যুবতী, বয়স প্রায় ১৭।১৮—পারুল ওরফে বুড়ী একেবারে তাহার ঘরের দুয়ারে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু আপাদমস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে সমাতৃক পারুলবালাকে ব্রজকিশো বলরাম দের ষ্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ীতে উঠাইয়া আনিয়া মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাদের পরিচর্য্যার জন্য দাসদাসী পাচক যেমন নিযুক্ত হইল—তেমনি রক্ষক অর্থাৎ ম্যানেজার পদে বাহাল হইল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সাহা।

ভদ্র পল্লীতে সঙ্গীত-সুধারস পানের তাদৃশ সুবিধা না পাইয়া, ব্রজবা এইবার খাঁটি সুধারস পানে মনোনিবেশ করিলেন।

জীবনটা যে এতদিন বৃথা গিয়াছে, এ চিন্তায় সময় সময় তাঁহার মন ব তিক্ত হইয়া উঠিত ; কিন্তু এখন যে তাহার সুদ-সুদ্ধ উঠাইতে পারিয়াছেন এই সান্ত্বনাতেই তিনি আজ মশগুল্।

সুধার উত্তেজনায় একদিন বলিয়াছিলেন—"আমার বৌটা কি সতী সাধ্বী পতিব্রতাই না ছিল ? দেখ' না, সে না মর্‌লে কি এই সুখ আমা ভাগ্যে ঘট্‌ত ? আহা পতিব্রতা, তাই মরে' আমায় এই সুখ দিয়ে গেল।" বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

পারুল মহা মুস্কিল বাধাইয়া তুলিল। একি! সে কাঁদিয়া, প ছড়াইয়া, দাপাইয়া, আত্মহত্যার কথা তুলিয়া, ব্রজকিশোরকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া,—হঠাৎ এক মহা অনর্থ বাধাইয়া দিল ব্রজকিশোর নির্ব্বাক! তাঁহার সব স্ফূর্ত্তি একেবারে হিম হইয় গেল।

বামা আসিল—কত সাধ্য সাধনা করিল,—কী ব্যাপার জানিবার জন্য যখন সকলে মিলিয়া ঘণ্টাখানেক কাল পর্য্যন্ত মুখে রক্ত তুলিল—তখন পারুল ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—"তার নাম কর্‌লে কেন? তবে আমাকে ও ভালবাসে না।..."

বহু কষ্টে, রাত্রি বারটার সময়, সে দুর্জ্জয় মান ভাঙ্গিল—একছড়া হীরার নেক্‌লেসের প্রতিজ্ঞায়। ব্রজকিশোর হাতে স্বর্গ পাইল, ভাবিল, বিবাহিত স্ত্রীও এমন কারো নাই—এ কথা জোর গলায় বলা যায়।

তিন বৎসর কাটিয়া গেল। নগদ টাকা যাহা ছিল, সব নিঃশেষ হইয়া কিছু ঋণও হইয়াছে। উত্তমর্ণ অবশ্য লোক ভাল—কোনও তাগাদা নাই। কারণ, সে একরকম আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই; অর্থাৎ বামাই এই উত্তমর্ণের সন্ধান মিলাইয়াছে; এবং সে-ই ব্রজবাবুকে, যখন যাহা দরকার পড়ে, আনিয়া দেয়। ইহারা এতই প্রাণ দিয়া ভালবাসে যে, ঋণদাতার সহিত বামা এ পর্য্যন্ত ঋণীর দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত ঘটিতে দেয় নাই—পাছে ব্রজবাবুর ইজ্জতের হানি হয়। এত যে করে, তাহার ধার কি শোধ হয়?

অথচ নিজের টাকা না হইলে বড়ই অসুবিধা হয়। আর ধারই বা কাঁহাতক করা যায়? ব্রজবাবু স্থির করিলেন. বহুদিন দেশে যান নাই;—একবার দেশের আব্‌হাওয়াটা কি রকম বুঝিয়া কিছু অর্থেরও উপায় করিয়া আসেন। লোকলজ্জা এখনও একেবারে যায় নাই। দেশে যে সকলে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া জানে! পারুল শীঘ্র ফিরিবার জন্য মাথার দিব্য দিয়া কাঁদিয়া ফোঁপাইয়া বহু কষ্টে বিদায় দিল।

বাবু বাড়ী আসায় তাঁহাকে দেখিতে দেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল।

সকলেই অবাক্ হইয়া গেল, পত্নীর শোকে এমন লোকটা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল! বংশটা পর্য্যন্ত লোপ পাইল! কী পত্নীপ্রীতি!

মেয়েরা বলিল—"আহা ভগবতী ঠাক্‌রুণ ছিলেন হাল্‌দার-গিন্নী,—তিনি যাওয়াতেই সব ওলোট-পালট হয়ে গেল।"

বাবুর অর্থাভাব শুনিয়া কর্ম্মচারীরা এবং গ্রামের মাতব্বর লোকেরা বলিল—"দান পুণ্য তীর্থ-ধর্ম্ম করেই লোকটা ফতুর হ'তে বসেচে।"

নায়েব বলিল—"দেখুন না, চেহারা কি হয়েচে? আজকাল সারা-রাত্রি কি বাই ধরেচে, না কে এক সাধু বলেচে যে, কালীঘাটে মা কালীর মন্দিরে বসে জপ করো। তাই উনি রোজ বৈকালে কালীঘাট যান, আর সকালে ফেরেন। এমন কর্‌লে আর বেশী দিন বাঁচবেন্ বলেও ত' মনে হয় না। ধর্ম্মকর্ম্ম করা ভাল, তাই বলে কি অত বাড়াবাড়ি উচিত?"

মধুসূদন বলিল—"রাজার কি আর বুড়ো বয়সে ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে গেলে শরীর থাকে?"

সব কথাই ব্রজবাবুর কাণে পৌছিল—তিনি ভাবিলেন—বাস্তবিকই, নরেন সত্যি কথাই বলেছিল, কলিকাতা মহানগরী—কে কার খোঁজ রাখে?

একুশ দিন পরে ব্রজবাবু কলিকাতায় ফিরিলেন। বাসায় পৌছিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িবার সময় দেখিলেন, টেবিলের উপর একখানি রেজেষ্ট্রী চিঠি। তাড়াতাড়ি কম্পিত হস্তে সেখানি লইয়া ভাবিলেন—রেজেষ্ট্রী করিয়া কে আবার পত্র দিল? বুকের ভিতর গুড়্‌গুড় করিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল। চিঠি পড়িয়াই তিনি চেয়ারে এলাইয়া পড়িলেন—চক্ষে সমস্ত অন্ধকার, পদতলে পৃথিবী যেন ঘুরিতেছিল।

পত্রখানি একজন উকীলের প্রদত্ত নোটীশ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সাহা ও শ্রীমতী বামাসুন্দরী দাসীর নিকট তিনি যে তিন হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন, তাহা পত্র-গ্রহণের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে সুদ সমেত চুকাইয়া না দিলে, উহারা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে ইত্যাদি।

ব্রজকিশোরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি এ চিঠি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ক্ষুৎ-পিপাসা কোথায় চলিয়া গেল! তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলেন।

বলরাম দের ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার নিযুক্ত পারুলের বাসায় আসিয়া দেখেন যে, সদর দুয়ারে দুইজন খোট্টা দারোয়ান্। এ কি? ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কার বাসা হ্যায়?"

দারোয়ান্ টুলে বসিয়া খৈনী টিপিতে টিপিতে উত্তর দিল—"বাবু রূড়মল্ শেঠকা, কেঁও?"

ব্রজবাবু ভাবিলেন—"স্বপ্ন দেখ্‌চি না তো? জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ বাড়ীমে পারুল বলে' একঠো মেয়েমানুষ থাকৃতা হ্যায়?"

দারোয়ান্ মুখ না তুলিয়া ঈষৎ বক্র হাসির সহিত ঘাড় নাড়িয়া, উত্তর দিল—"আছে—আছে, বাবু।"

ব্রজবাবু পারুল আছে বলিয়া প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু দারোয়ান্ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুই বাহু বিস্তার করিয়া পথ রোধ করিয়া বলিল—"এ কি বাবু? দুস্‌রাকো ঘর্‌মে কাহে ঘুস্‌ছো?"

"দুসরাকো ঘর?" ব্রজকিশোরের মুখ পাংশুবর্ণ হইল, স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি সেখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। হঠাৎ উপর পানে

নজর পড়িতেই দেখিলেন, রুদ্রমলের গলবেষ্টন করিয়া পারুল দাঁড়াইয়া ;—উভয়েই তাহার পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। নরেন ছাদের উপর আলিসার ফাঁক দিয়া সব দেখিতেছিল—চোখাচোখি হওয়া মাত্র লুকাইয়া পড়িল।

রুকুন্‌পুরে রটিল—পত্নীশোকে কঠোর যোগসাধনা করিতে গিয়া ব্রজকিশোর বাবুর হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

বন্ধু

সাত বৎসর বয়সে প্রকাশের পিতৃবিয়োগ হয়—সে আজ দশ বৎসরের কথা। প্রকাশের পিতা রামহরি মজুমদার প্রথমাবস্থায় বড়ই গরীব ছিলেন। পরে পূর্ব্ববঙ্গে কোন এক পাটব্যবসায়ীর অধীনে বৎসর দশ কার্য্য করিয়া রামহরি যখন দেশে ফিরিলেন, তখন তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও প্রকাণ্ড দোতলা ইমারত ফাঁদা দেখিয়া গ্রামের লোক একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। বিনা পণে বর, সুবিধামত চাকরী ও মনোমত পত্নী লাভ করা শক্ত! হঠাৎ রামহরির এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণটা অনেকেরই অনুসন্ধানের একটা খুব প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িল। এ সকল কার্য্যে কখনই লোকের অভাব ঘটে না—হারাধন নাগ সম্প্রতি পুলিশের জমাদারী হইতে বিতাড়িত হইয়া বেকার অবস্থায় গৃহে বসিয়া আছেন, তিনি স্বেচ্ছায় এই তদন্তের ভার লইলেন। যোগ্য ব্যক্তির হাতে কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া লোকে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কোন রকমে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে হারাধন স্বাধীন গবেষণার ফল প্রকাশ করিলেন। তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত রামহরি মজুমদার জনৈক পাটব্যবসায়ী বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানকে দুর্দ্দশার গভীর তলে নিমজ্জিত করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা এবং চৌর্য্যযোগে এই বিপুল অর্থ অর্জ্জন

করিয়াছেন। রামহরির বিদ্যাবুদ্ধি অসাধারণ বা অলৌকিক রকমের কিছু একটা বলিয়া গ্রামবাসীদের কোন কালেই ধারণা ছিল না! সেই জন্যই হউক, বা হঠাৎ বড়লোক হইবার পক্ষে উক্ত কারণই বিশেষ প্রযুক্ত বলিয়া বিশ্বাসবশতই হউক—কিম্বা নাগ মহাশয়ের গবেষণাটি অত্যন্ত মুখরোচক এবং সহজবোধগম্য বলিয়াই হউক—লোকে বিনা দ্বিধায় একবাক্যে নাগ মহাশয়ের কথাই বিশ্বাস করিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। রামহরি গরীব ছিলেন তিনি যে হঠাৎ সবাইকে উঁচাইয়া এত বড়লোক হইবেন, ইহা সহ্য করা যায় না। এইটিই রামহরির ভারি অন্যায়। যেখানে ক্ষত সেইখানেই হাত ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মনের এই ক্ষতটি অতর্কিত হস্তার্পণে পীড়িত হইতে থাকিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল কিসে রামহরিকে ধরাইয়া দেওয়া যায়।

রামহরি কোন কালেই মিশুক ছিলেন না—এখন ত নয়ই। ইহাতে লোকে তাঁহার টাকার গরমই দেখিত! কিন্তু রামহরি সব খবরই পাইতেন,—লোক অনেক রকমেরই হয় কিনা? অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া রামহরি আপনার নগদ বৃদ্ধির যেমন সুবিধা করিলেন—তেমনি দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়কেও তদ্দ্বারা হাত করিয়া ফেলিলেন। আশপাশের ছোট ছোট গ্রাম কয়েকখানি এবং স্বীয় গ্রামেরও খানিকটা রামহরি যখন নীলামে ডাকিয়া লইয়া একটি ছোটখাট "জমিদার" পর্য্যন্ত হইয়া পড়িলেন, জল্পনা কল্পনাও তখন বর্ষান্তে পয়োনালীর জলের মত ক্রমশঃ শুকাইতে লাগিল। তবুও কতকগুলি লোক ভাবিত যে, একদিন তাহারা রামহরিকে নবগ্রাম থানার লালপাগড়ী মাথায় খোট্টা কনেষ্টবল কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইতে কিম্বা জেলা আদালতের চাপরাসীগণ কর্ত্তৃক

তাহার বাড়ী ঘর ক্রোক করিতে দেখিবে। কিন্তু আট বৎসর কাটিয়া গেল ; সেরূপ কেহই আসিল না ! রামহরি মরিয়া গেল, তবুও না।

দশ বৎসর অতীত হইয়াছে, কনেষ্টবল ও পেয়াদার আশা অনেকে ত্যাগ করিয়াছে ; যাঁহাদের দূরদর্শিতা ও ঔদার্য্যগুণে ঐ দুরাশা পরিত্যাগের দুর্ভাগ্যটুকু হয় নাই—তাঁহারা অধর্ম্মের ঈদৃশ প্রাদুর্ভাবে কলিযুগের মানবজাতির জন্য নিতান্ত চিন্তিত ও ম্রিয়মান হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কোনওরূপে বাঁচিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে প্রকাশ পিতৃসঞ্চিত অর্থভাণ্ডারে আগ্রহলোলুপ দৃষ্টিপাত করিল, এবং লোকে যখন বুঝিল যে এ অর্থস্তূপ প্রকাশচন্দ্র কর্ত্তৃক নিঃশেষে অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা—তখন সকলেই একটু আশ্বস্ত হইল। গ্রামে অনেক যোগ্য ব্যক্তির অস্তিত্বসত্বেও রামহরির হঠাৎ অর্থশালী হইবার যে উক্ত সুযোগ ঘটিয়াছে, ইহাতে ভগবানেরও যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখা যাইতেছে—সুতরাং যাহাতে এই অর্থ অচিরে পক্ষবিস্তার করিয়া ভগবানের মুখে চুণকালি প্রদান করে—তাহার জন্য লোকে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল।

গ্রামের গরীব বেহারী চক্রবর্ত্তীর দুইটি পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া পড়ে দেখিয়া প্রকাশের জননী সুখদাসুন্দরীরও ইচ্ছা হইল, তাঁহার পুত্রও কলিকাতায় গিয়া পড়াশোনা করে, কারণ তাঁহার বিশ্বাস পাড়াগাঁ হইতে সহরে লেখাপড়া অনেক ভাল হয়। সুখদাসুন্দরীর নারীজীবন সার্থক করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে যে বংশের দুলাল তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—তাহার সুশিক্ষা, সদাচার, সুখসমৃদ্ধির যথোচিত বিধান করিবার জন্য তাঁহার মাতৃহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু

প্রকাশ মনে মনে বিষম বিপদ গণিল। কারণ, গ্রামে সে অপ্রতিহত উচ্ছৃঙ্খলায় যে আনন্দ অর্জ্জন করে, কলিকাতা সহরে অপরিচিতদের মধ্যে সে সুখ লাভের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। প্রকাশ কলিকাতা যাইতে একবারে বাঁকিয়া বসিল। পরে বেহারী চক্রবর্ত্তীর ছেলেদের মুখে কলিকাতার সাহেববাড়ী, গড়েরমাঠ, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, থিয়েটার প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়া কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই কলিকাতায় শুভ যাত্রা করিল।

প্রকাশ কলিকাতা আসিয়া গ্রামের পাঁচু ও ভোলার সহিত তাহাদের মেসেই প্রবেশ করিল—এবং এণ্ট্রান্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। এই মেসে তিন বৎসর থাকিতে থাকিতেই প্রকাশচন্দ্র অনেক বাহ্যজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া ফেলিল।

এবার ছুটিতে বাড়ী হইতে ফিরিয়া মায়ের সম্মতিক্রমে প্রকাশচন্দ্র এক স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিল, কারণ তাহার মত বড়লোকের ছেলের মেসে থাকিয়া পড়া কলিকাতায় অতি নিন্দনীয়। ধনী বলিয়া একটা অহঙ্কার সুখদারও ছিল সুতরাং তিনিও তেমন আপত্তি করিলেন না। প্রকাশের জন্য মাসিক দুই শত টাকা করিয়া খরচ দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন; কেন না, প্রকাশ জমিদারের ছেলে, একমাত্র বংশধর,—তাহার বেহারী চক্রবর্ত্তীর ছেলেদের সঙ্গে গরীবানা ভাবে থাকা সাজে না। তাহার অভাব কিসের?

বৎসরখানেকের মধ্যেই প্রকাশের বিস্তর বন্ধু জুটিয়া গেল। এখন সে যত রাত্রি পর্য্যন্ত ইচ্ছা বাহিরে থাকিতে পারে, ইচ্ছামত স্কুলে যায়, সপ্তাহে চারি দিন থিয়েটারে যায়, যাহা ইচ্ছা অনায়াসে অসংকোচে

করিতে পারে—ইষ্টুপিট্ পাঁচু-ভোলার তোয়াক্কা আর রাখে না। উহাদের অভিভাবকতা ও নির্দ্দেশের গণ্ডী এড়াইয়া প্রকাশ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল।

বিদ্যালয়ে যাওয়া যখন একান্ত ইচ্ছাধীন তখন না গেলেও কোন ক্ষতি হয় না। কার্য্যতঃ ঘটিলও তাই। স্কুলে না গেলেও প্রকাশের জ্ঞানার্জ্জনে কিছুমাত্র আলস্য ছিল না। বিগত দুই বৎসরের মধ্যে কোন্ থিয়েটারে কি কি অভিনয় হইয়াছে—কোন্ ব্যক্তি কিসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, কোন্ নটী সুকণ্ঠী, কে সুবক্ত্রী, কে সুনর্ত্তকী, কে সুরূপা, কোন্ গলি কোন্ ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইয়া কোথায় শেষ হইয়াছে, কোন্ রাস্তায় কোন্ কোন্ ধনীর গৃহ, কলিকাতার বিখ্যাত গুণ্ডাদের নাম, পুলিশ আদালতে কোন্ দিন কয়টা পাঁচ আইনের মোকদ্দমা হইয়াছে, কোন্ হাকিমের কাছে পাঁচ আইনের বিচার হইলে সুবিধা হয়, কোন্ কোন্ তারিখে কয়টি লোককে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ অসদাচরণ হেতু রঙ্গালয় হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ শৌণ্ডিকালয়ে রাত্রি আটটার পরেও গোপনে মদ্য বিক্রয় হয়—প্রভৃতি কলিকাতার অতি-প্রয়োজনীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য সংবাদগুলি প্রকাশচন্দ্রের একবারে কণ্ঠস্থ। কেশ বেশ ভাষা ভঙ্গী যতটা পারিয়াছে—প্রকাশ কলিকাতার ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছে।

ছুটিতে প্রকাশ যখন বাড়ি আসিল, তখন করুণাময়ী জননী পুত্রের কথাবার্ত্তায় হাবেভাবে শিক্ষা ও সভ্যতার পরিবর্ত্তন চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া অতীব প্রশংসমান কৌতুহলের সহিত সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে গৌরবে আহ্লাদে ও আত্মপ্রসাদে একেবারে তন্ময়

হইয়া গেলেন। গ্রামের অন্যান্য বালকগণের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন —যে প্রকাশ সেই বর্ব্বরের দল হইতে কত উচ্চে! সুখদা ভাবিলেন— এতদিনে অর্থব্যয় সার্থক হইল। প্রকাশের ব্যয় যতই বাড়ে, অকুণ্ঠিত-চিত্তে সুখদা তাহা বহন করেন, আর ভাবেন—কত ভাগ্যে হলো না হলো না করে ত' ঐ একটা ছেলে! সবই ত' ওর! পুত্রের উজ্জল ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া মায়ের হৃদয় পুলকে স্নেহে বাৎসল্যে ভাদ্রের গঙ্গার মত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

(২)

প্রথম প্রথম প্রকাশচন্দ্র পঞ্চাননের ও ভোলানাথের সঙ্গে গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে নিয়মিত বাটী আসিত, আবার তাহাদের সঙ্গে চলিয়া যাইত। গত পূর্ব্ব বৎসরও একবার আসিয়াছিল, কিন্তু গত বৎসর হইতে আর সে একেবারেই আসে নাই। মা খুব পীড়াপীড়ি করিল, প্রকাশ সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিল যে—পরীক্ষা সন্নিকট, পড়ার বড়ই চাপ, সুতরাং বাড়ী গিয়া সে এখন আর মূল্যবান্ সময়ের অপব্যবহার করিবে না।

প্রবেশিকা পরীক্ষা হইয়া গেল। যথাসময়ে ফলও বাহির হইল। গ্রামে চৌধুরী মহাশয় হিতবাদী লইতেন—তিনি পরীক্ষার ফল দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুষ্ঠব্যাধির পাঁচন, সিংহরসায়ন সালসা, সাতটাকা বেতনের নায়েবী কর্ম্মখালি প্রভৃতি পড়িয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে বহুকষ্টে প্রকাশচন্দ্র মজুমদার নাম বাহির করিয়া সুখদাদেবীকে খবর পাঠাইয়া দিলেন, যে প্রকাশ দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গ্রামের ২।১ জন ছাত্র যাহারা কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত

তাহারা জানিত যে, প্রকাশ সম্প্রতি অন্য বিদ্যালয়ে যায়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কোন স্কুল কলেজে তাহার নাম পর্য্যন্ত নাই। এ প্রকাশচন্দ্র রামহরি মজুমদারের একমাত্র বংশধর প্রকাশচন্দ্র যে নহে—এ কথা বালকেরা প্রতিবাদ করিবামাত্রই মুরুব্বীর দল অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তাহারা যতই হোক্, বালক—কে তাহাদের কথা শোনে? গ্রামের বয়স্ক এবং তাহাদের পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ চশমা চোখে দিয়া প্রত্যেক হরফ বানান করিয়া যাহা পড়িয়াছেন—তাহাতে আর ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা কোথায়? আর কলিকাতায় যে একাধিক প্রকাশচন্দ্র মজুমদারের অস্তিত্ব সম্ভব—একথা সে জ্ঞান-বৃদ্ধদিগকে বুঝানো খুবই শক্ত ব্যাপার; কারণ যুক্তি তর্কে তাঁহাদিগের মত খণ্ডনের প্রয়াসটা তাঁহাদের মতে কলিকালোচিত বাচালতা, এবং গুরুভক্তির অভাবব্যঞ্জক। সুতরাং কোন সুবোধ বালকই বনিয়াদী সুনাম খোয়াইয়া, কর্ত্তাদের নিন্দার্হ হওয়া উচিত বিবেচনা না করিয়া মজুমদারদের বাড়ীতে হরিল্লুট কুড়াইতে চলিয়া গেল। মোহন ময়রা তাহার বহুদিনের পাঁচ সের রসগোল্লা একবারে বিক্রয়ের আনন্দাতিশয্যে হাটে বাজারে তখনই রাষ্ট্র করিয়া দিল যে, তাহাদের প্রকাশবাবু পাশ হইয়াছেন।

(৩)

অভাব না হইলে আবিষ্ক্রিয়া হয় না। মাসিক দুইশত টাকাতেও প্রকাশের পড়ার খরচ যখন কুলাইতেছিল না, তখন সে ভাবিতে লাগিল, কি কৌশল অবলম্বন করিলে জননী তাহাকে আরো বেশী টাকা মাসোহারা বন্দোবস্ত করিতে পারেন। উপায় অনেকগুলি ঠাওরাইল, কিন্তু একটিও পছন্দসই হইল না বলিয়া সবগুলিকে নামঞ্জুর করিয়া প্রকাশ-

চন্দ্র তাহার অকৃত্রিম সুহৃৎ মাখনলালের পরামর্শ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কলিকাতায় আসিয়া অবধি প্রকাশের যতগুলি বন্ধুলাভ হইয়াছে তন্মধ্যে মাখনকেই প্রকাশ সমধিক স্নেহযত্ন ও সম্মান করিত। মাখনে বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া সে বিস্মিত হইত। সত্যকথা বলিতে কি, তাহাকে সে একটু ভয়ও করিত। এ ছাড়া আরও অনেক নিগূঢ় কারণের জন্য প্রকাশ মাখনের নিকট কৃতজ্ঞ ছিল। মাখনকে সে প্রাণ খুলিয়া সব কথা বলিত, তাহার পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজই সে করিত না।

মাখনের বয়স ২৫।২৬, বেশ দোহারা ফর্সা ছেলেটি। মাখনের একটু গাম্ভীর্য্য ছিল, সে বেশী কথা বলিত না, হাসিত কম। সে কথা বলিত যেন ওজন করিয়া; কেবল কাজের কথা ছাড়া বাজে অত্যন্ত কম বলিত সে প্রকাশের কাছে প্রত্যহই একবার করিয়া আসিত কখনও দুইবারও আসিত, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিত না। তাহার নিত্য আসার এ পর্য্যন্ত কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। মাখনকে দেখিলেই তাহার বন্ধুরা যেন কেমন কেমন হইয়া যাইত, তাহার কারণ তাহার গম্ভীর মুখমণ্ডলে প্রশান্ত চিন্তাশীলতার ছায়া—যাহা বন্ধুবর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে মাখনের প্রতি একটা ভীতি এবং একটা অকারণ সম্মানের দাবী করিত। সে দাবী কেহ উপেক্ষাও করিতে পারিত না।

মাখনের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে বলিয়া কলিকাতার এক হৌসে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সে একটা কর্ম করিত। কেরাণীগিরি করিলে কি হয়, প্রকাশ বলে ও রকম চোকস ইয়ার ছোক্‌রা মেলা দুষ্কর। তাহার এত সন্ধান, এত খবর, এত মাথা

যে প্রকাশের মত ধনী ব্যক্তিও তাহাকে "গুরু" বলিতে গৌরব বোধ করিত। প্রকাশ বলে—"আমার টাকা আর মাখনের বুদ্ধি এ যেন হুইস্কির উপর বর্ম্মা চুরুট।" সুতরাং মায়ের কাছে টাকা আদায় করিবার অকাট্য ফিকিরও একমাত্র মাখনই বাৎলাইতে সক্ষম। সুতরাং প্রকাশ মাখনকে স্মরণ করিল।

দুপুরের পর মাখন আসিল। প্রকাশ মাখনের মুখে একটা স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হঠাৎ বিমর্ষভাবে বলিল—"এ দু'শো টাকায় তো আর কুলুচ্ছে না। যাতে টাকাশো পাঁচেক ক'রে মাসে পাই—অথচ মা কোনও সন্দেহ না করে—এর একটা বিহিত তোমায় করে' দিতেই হবে।"

মাখন সহজ স্বরেই বলিল—"একথা তুমি তোমার মাকে লেখ' না কেন? তা' হলেই ত' তিনি দেবেন্।"

প্রকাশ বলিল—"তার একটা কিছু কারণ তো দর্শাতে হবে—কি বলে' চাই? আর একটা কেমন ভয় হয়, লজ্জাও ঠেকে—অথচ আমার টাকা চাই, তাই ত তোমায় একটা উপায় ঠাওরাতে ডেকেচি।"

মাখন চক্ষু বুঁজিয়া কিয়ৎকাল ভাবিল। শেষে সহাস্য বদনে বলিল—"এর জন্যে আর ভাবনা কি?"

ভাবনার কোনই হেতু নাই শুনিয়াই প্রকাশ একবারে এক লম্ফে উঠিয়া মাখনকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া ফেলিল।

মাখন একে প্রাকৃতিক উষ্ণতাতেই বিলক্ষণ উত্যক্ত, সুতরাং সে সময়ে বন্ধুবরের মস্তিষ্কের উষ্ণতা নিবন্ধন উক্ত মানবেতর জীববিশেষের মত বাহুবেষ্টন সহ্য করিতে একবারেই প্রস্তুত না হইয়া, মুক্তি প্রার্থনা

করিল। কারণ বন্ধুর আলিঙ্গন অপেক্ষা পাখার বাতাসে সে বিশেষ আরাম বোধ করিতেছিল। প্রকাশ ছাড়িয়া দিলে মাখন বলিল—"আমাকে একটু ভাল করে' গুছিয়ে ভাবতে দাও।"

প্রকাশ অদূরে একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করিয়া বলিল—"ভাই, তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। তুমি যা' করে' আমার মুখ রক্ষা করেচ'! তুমি যদি না বলতে তবে আমি মা'কে নিশ্চয় লিখতুম্ 'পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি' কিন্তু আবার কেমন মজা! আমার লিখবার আগেই দেখি—গাঁয়ের সবাই ওটা পড়ে আমাকেই ঠিক করেচে! একেই বলে ভগবানের দয়া! কিন্তু সব ফস্‌কে যেত, যদি তুমি অই পরামর্শটা না দিতে! অই মাথার জোরেই যখন এণ্ট্রান্স পাশ করেচি—তখন অই মাথার জোরেই আবার এফ, এ, ও পড়্‌ব।"

মাখন একটু হাসিল। বলিল—"শোন', কি বলে তোমার মাকে টাকা চাইবে! বল্‌বে—আমি যে পাশ করেচি, সে জন্যে আমার এখানকার বন্ধুবান্ধবেরা একদিন আমোদ করে খেতে চাচ্ছেন। তাঁরা সবাই কোলকাতা সহরের বড় বড় লোকের ছেলে, রাজা মহারাজার বংশ—তাঁদের বাড়ী আমি অনেকদিন খেয়েচি, কিন্তু কখনও খাওয়াতে পারি নি। কখনও খেতে চাইলেই যা' তা' একটা ওজর করে সেরে দিয়েচি—কিন্তু এখন ত' আর ওজর করা চলে না', খাওয়াতেই হবে; নইলে আমাদের আর মুখ রক্ষা হয় না! তারপর, আপনি গাঁয়ে জোড়া পাঁঠা দিয়ে সর্ব্বমঙ্গলার পূজো দিয়েচেন—এখানে একটা মস্ত পীঠ কালীঘাটের কালী—এখানেও একটা পূজো দেওয়া উচিত। আর স্কুলে পড়া নয়, এখন হ'তে কলেজে পড়া। বই-ই তো প্রায় হাজার

টাকার লাগ্‌বে। তা ছাড়া কলেজের মাইনেও মাসিক ২৫ টাকা। সুতরাং এখন হ'তে, বুঝ্‌তেই পার্‌চেন, খরচ অনেক বেশী পড়্‌বে। অন্ততঃ প্রথমকার এ ধাক্কাটাতেই তো প্রায় দু' হাজার। কারণ বন্ধুবান্ধবদিগকে খাওয়ান আর কালীঘাটে পূজো দেওয়াতে প্রায় সাত আটশো টাকা। আর সব বই এখন কিন্‌বো না মনে করেচি, যে ক'খানা খুব দরকারী সেই ক'খানাই নেব', তাতেও প্রায় ৭০০ টাকা; বাকী বই যখন যেমন দরকার পড়বে—তেমনি এক আধখানা ক'রে কিনে নিলেও চল্‌বে। অতএব আপাততঃ দেড় হাজার টাকা আমার চাই-ই। আর মাসিক ২০০তে কুলাবে না, ৩০০ করে লাগ্‌বে। এই ব'লে একখানা চিঠি লিখে দাও।"

প্রকাশ "ব্রেভো, ব্রেভো" বলিয়া মাখনের পিঠ চাপড়াইয়া দিল।

"হাঁ,—এও লিখে দাও যে ঐ টাকার অভাবে এখনও ভর্ত্তি হতে পারি নাই—পড়া শুনা কামাই হচ্ছে।" বলিয়াই মাখন গাত্রোত্থান করিল। প্রকাশ হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল "যাও কোথা? আমায় গুছিয়ে বলে যাও, আমি লিখে ফেলি।"

মাখন বসিল। প্রকাশ ভৃত্যকে দুই বোতল পিল্‌সেনিয়ার বিয়ার হুকুম করিয়া জননীকে পত্র লিখিতে বসিল। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিই মাখন গুছাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল।

(৪)

মানুষের যখন শক্তি থাকে, তখন সে কি বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ কিছুই ভাবে না। বর্ত্তমানের উত্তেজনা ও মোহ এত প্রবল যে সে শুধু বাহিরের চক্ষে ধুলা নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না—ভিতরকার চক্ষুটিকেও সজোরে

টিপিয়া একবারে অন্ধ করিয়া তবে ছাড়ে। ক্রমশঃ শক্তি যেমন ক্ষীণ হয়, তাহার কঠিন মুষ্টিটিও তেমনি শিথিল হইতে থাকে। তখন সেই আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া জগতের আলো-ছায়ার কম্পলীলা গোচর হয়। সুতরাং সুখদাদেবীর যতদিন পর্য্যন্ত টাকার ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল, ততদিন নিজে তো বুঝেনই নাই, কেহ বুঝাইলেও বুঝেন নাই—দেখিয়া বুঝা তো দূরের কথা! রামহরি যে উপায়েই হউক ধনসঞ্চয় করিয়া জমিদারী পর্য্যন্ত কিনিয়া দিয়া গিয়াছেন, তেজারতীতেও কিছু বাড়াইয়াছেন। কিন্তু সে বিত্ত এত বেশী নয় যে প্রকাশচন্দ্রের কলিকাতার এই অপরিমিত ব্যয়-বাহুল্য এত-দিন ধরিয়া বহন করে। মাসিক দুই শত টাকা, তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কাপড়চোপড় পুস্তকাদিতে বাৎসরিক গড়ে হাজার টাকা করিয়া যোগাইয়া ভাণ্ডারের নগদ টাকার পূর্ণ বাক্সগুলি শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

সুবৎসরে যে অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ড একদিন দৈবের অকস্মাৎ জলধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া তাহার সকল ফসলকে সার্থক, সকল দৈন্যকে বিলোপ এবং সকল অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল—সে যে চিরদিনই তেমনি প্রচুর শস্য উৎপাদন করিবে, তাহার শক্তি অক্ষয় থাকিবে, তাহার ভাণ্ডার অনন্ত রহিবে—এ আশা করা অন্যায়। কিন্তু এ অন্যায্য দুর্ব্বলতা সুখদার ছিল, তিনি এটাকে গৌরবই ভাবিতেন। তাই এখন প্রকাশ যখন মাসিক তিন শো টাকা করিয়া চাহিয়া বসিল এবং সেই সঙ্গে একবারে দেড়হাজার টাকার এক ফর্দ্দ পেশ করিল, তখন সুখদাদেবী খুবই মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। ঘরে এত টাকা নাই, এটা বড়ই অসঙ্গত ঠেকিল। অথচ পিতৃহীন পুত্রের কলেজে পড়ার ব্যয় বহন করিতেই হইবে। এখনও সমস্ত জমিদারী মজুত। প্রবুদ্ধ

মাতৃশক্তির এ প্রেরণা তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। তদ্ভিন্ন গ্রামে, আশ-পাশ গ্রামে জমিদার বলিয়া একটা খ্যাতি আছে, সেটা তাঁহার স্বামীর—সেটিকেও বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। ছেলে মনে দুঃখ করিবে যে পিতা নাই বলিয়া তাহার পড়া হইল না। গ্রামের হিংসুক লোকেরা টিট্‌কারি দিবে যে এত টাকার জমিদারি থাকিতেও ছেলেকে পড়াইতে পারিল না! কিন্তু এত সব সমস্যার সমাধান করিবে যে অর্থ, তাহার রাশিতেই রিক্তা দোষ ঘটিয়াছে। এ কথা কিছু লোককে বলিবার নয়। সুতরাং লোকেও জানে না। আর প্রকাশ তো ছেলে—শিশু—সে কি খোঁজ রাখে? কর্ত্তার একান্ত ইচ্ছা ছিল ছেলেকে পড়াইয়া জেলায় উকিল করিয়া বসাইবেন। স্বামীর এই আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া পূর্ণ করিবেন, পতিপ্রাণা পুত্র-স্নেহময়ী সরলা সুখদাদেবীর ইহাই এক গভীর চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

ইঞ্জিনে যতক্ষণ ষ্টীম থাকে ততক্ষণ না থামাইলে থামে না, আবার ষ্টীম নিঃশেষ হইলে চালাইলেও চলে না। সুখদাদেবীর এতদিন ষ্টীম ছিল, ঘাটে পথে ষষ্ঠীতলায় ঠাকুরবাড়ীতে যাইতেন, পরিচিতদের মধ্যেই ঘুরিতেন, কিন্তু কোথাও দাঁড়াইতেন না। মৌখিক ভদ্রতা রক্ষা ছাড়া অন্য কোন কথা, কোন আলাপই হইত না। ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, পতি-পুত্রের নিন্দাবাদ, সুখদার চতুর্দ্দিকে একটা দুর্ভেদ্য বেষ্টনী রচনা করিয়াছিল; সেটিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য লোকেও যেমন সুখদার নিকটে আসিতে পারিত না, সুখদাও তেমনি কাহারও নিকটে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। যাইতে গেলেই এই বেষ্টনীর লৌহ গরাদেতে মাথা ঠুকিয়া যাইত।

কাজেই টাকাও যত ফাঁক হইতেছে, সে গরাদেও তত ফাঁক হইতেছে। এখন আর সুখদার নিজেকে তেমন স্বতন্ত্র এবং ধনী বলিয়া সম্মানের দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে প্রবৃত্তি হইত না। সেই গরীব উপেক্ষিত নিন্দুকের দলকে তাঁহার ব্যাকুলচিত্ত দুইখানি সাগ্রহ বাহু বাড়াইয়া একটু সমবেদনা একটা সদয় পরামর্শের জন্য অতি কুণ্ঠিত সঙ্কোচে এখন সর্ব্বদাই আহ্বান করিত।

ক্ষিপ্তের চিন্তা গৈরিক স্রাবের মত ছুটিয়া বাহির হইতে চায়। সে পথ খুঁজে। আকস্মিক এই মুস্কিলে সুখদা পাঁচটি সহৃদয় হৃদয় খুঁজিতেছে। ঘাটে পথে সকলে পরস্পর নিঃশঙ্ক সরলতায় নিজের নিজের দুঃখ সুখের গল্প করে, অথচ কেহই তাঁহার দুঃখ শোনে না—বা তাহাদের কথা শুনিতেও তাঁহাকে কেহ ডাকে না। সুখদা আপনার একক দৈন্তে আপনিই পীড়িত হইয়া স্বকৃত ক্ষতের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের কাছে কাছে পাশে পাশে অনাবশ্যক বিলম্বে এ কাজে সে কাজে ব্যস্ত থাকেন—যদি কেউ একবার ডাকে!

কিন্তু তাঁহার সহিত মর্ম্মকথার বিনিময় করিতে কেহই যখন অগ্রসর হইল না, তখন তিনি নিজেই একটা বৈচিত্র্যের মত তাহাদের প্রসঙ্গে অল্প অল্প করিয়া যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে একটু ভয়ও আছে—পাছে কেউ বিদ্রূপ করে। দুঃখনিরাশায় ঔদাসীন্য বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু পরিহাস বড়ই মর্ম্মান্তিক।

তৃষিতই জলের ধারে যায়—জলকে নড়িতে বড় একটা দেখা যায় না। কাজেই সুখদা একথা সেকথা করিয়া নানা অবান্তর প্রসঙ্গে প্রতিবেশিনী-

দিগের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। এরূপ ঘনিষ্ঠতা করিবার আরও একটা গোপন কারণ ছিল। কিছুদিন হইতেই সুখদা পুত্রের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ কানাঘুষা কথা শুনিতেছিলেন। তারপর বেহারী চক্রবর্ত্তীর পুত্রদ্বয় পাঁচু ও ভোলা যখন কেহ তিনটি কেহ তিনটির পর ওকালতীও পাশ করিয়া ফেলিল, তখন সন্দেহটা কিছু বদ্ধমূল হইল।

লোকের কথায় প্রথম প্রথম সুখদা কর্ণপাত করেন নাই, কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে গ্রামের কর্ম্মহীন ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণ প্রকাশের পাঠোন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া উক্তরূপ উপন্যাস রচনা করে; কিন্তু এখন আর তাঁহার সে বিশ্বাস রাখিবার শক্তি নাই। বিশেষতঃ বেহারী চক্রবর্ত্তীর মত আজ খাইয়া কাল কি খাইবে যাহার ঠিক নাই এমন গরীব দুই দুইটি ছেলেকে কলিকাতায় রাখিয়া, পড়াইয়া যখন উকীল করিয়া ছাড়িল। প্রকাশ একটা পাশ করিতেই এত টাকা ব্যয় করিল, দ্বিতীয় পাশের ব্যয়েরও আভাস পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে খরচ ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উকিল হওয়া পর্য্যন্ত তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। কিন্তু ঐ যে পাঁচু উকীল হইল—ভোলা তিনটি পাশ করিল, কয় কোটি টাকা উহাদের খরচ হইয়াছে? কাজেই প্রকাশ যে অতিমাত্রায় অপব্যয় করিতেছে—সে তথ্য বুঝিতে আর সুখদার বাকী থাকিল না। তেমন বিশ্বাসযোগ্য কোনও প্রমাণ না পাইলেও সুখদার বিশ্বাস যে, প্রকাশের চরিত্রেও কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে।

চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমাইবার সুখদার প্রবল ইচ্ছা ফলবতীও হইল। সুখদা চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন

যে, তাঁহাদিগকে পাঁচু ও ভোলার কলিকাতায় মাসিক কত টাকা খরচ দিতে হইত ?

পাঁচুর মা যথাযথ উত্তর দিলেন। সুখদা শুনিয়াই গালে হাত দিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার তেমন বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও বিস্মিত হইয়া সুখদা প্রশ্ন করিলেন—"মাসিক চল্লিশ টাকাতে পাঁচু ভোলার দুই ভ'য়েরই খরচ কুলাতো ?" পাঁচুর মা সরল ভাবেই উত্তর দিলেন—"তা ভাই, আমরা গরীব মানুষ—এই চল্লিশ টাকা ক'রে দিতেই জিব বেরিয়ে গেছে। যে-কষ্টে ছেলে দু'টিকে মানুষ করলাম—তা এক ভগবানই জানেন। এরই মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার উপর দেনা হয়ে গেচে। এ ধার শোধ দেওয়া আমাদের সাধ্যি নেই—বুঝ্‌তেই পারচো ত' দিদি, ভগবান্ যদি দিন দেন, তবে যাদের জন্যে ধার, তারাই শোধ করবে। আশীর্ব্বাদ কর বোন্, ওরা বেঁচে থাকুক।" বলিয়াই স্নেহে ও পুত্রগৌরবে চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর দরদরধারায় আনন্দাশ্রু বহিয়া পড়িল।

অনেক একথা-সেকথার পর পাঁচুর মা পুত্রদের নিকট প্রকাশের বিষয় যাহা শুনিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহাও শুনাইয়া দিয়া তিনি সুখদার কৌতূহল নিবারণ করিলেন। সুখদা শুনিলেন, প্রকাশ পাশ হয় নাই ; প্রকাশ অন্য ব্যক্তির নাম নিজের বলিয়া জানাইয়া তাঁহাকে ঠকাইয়াছে। প্রকাশের কলিকাতার বাসা একটা মদের মস্ত আড্ডা—সেখানে প্রকাশের অনেক নূতন নূতন বন্ধু জুটিয়াছে এবং মৃত রামহরির অর্জ্জিত ও যত্নসঞ্চিত অর্থ মদের একটি সদাব্রত-স্থাপনে এবং জনৈকা অসহায়া পতিতা রমণীর ভোগ-বিলাসে সদ্ব্যবহারে লাগিতেছে। সুখদা একটি বর্ণও অবিশ্বাস করিলেন না, একটি কথারও প্রতিবাদ করিলেন না।

দুঃখে, অপমানে, রাগে, ঘৃণায় তাঁহার প্রবঞ্চিত মাতৃস্নেহ আহত উরগের মত সেই দণ্ডেই দংশন করিতে উদ্যত হইল। পুত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র মাতৃহৃদয় প্রবল বিদ্রোহে গর্জ্জিয়া উঠিল।

দুই তিনখানি চিঠি লিখিয়া প্রকাশ যখন উত্তরও পাইল না, টাকাও পাইল না, তখন দিল্‌জানের নিকট হইতে মাত্র তিন দিনের ও দুই রাত্রের ছুটি লইয়া স্বয়ং একদিন সন্ধ্যাকালে হঠাৎ বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল।

(৫)

প্রকাশকে নিকটে পাইয়া সুখদার একরকম ভালই হইল,—বোঝাপড়ার একটা কিনারা হইল। প্রকাশ যেন খুব দুঃখিত হইয়া বাড়ী আসিয়াছে। পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে তজ্জন্য বিশেষ কুপিত—এইরূপ ভাণ করিবে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সুখদার মুখভাব দেখিয়া বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িল। কাজেই গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াই জননীকে একচোট কতকগুলা কড়া কথা শুনাইয়া দিবার যে সংকল্প ছিল—সেগুলি তাহার মনের কোটরেই আবার ফিরিয়া গেল, বাহির হইতে সাহসী হইল না। অথচ ব্যাপারটা কি—তাহা জানিবার জন্য প্রকাশের মন অধীর হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিতে গেলে কি জানি কি কথা বাহির হইয়া পড়ে! অতএব যতক্ষণ চাপা থাকে ততক্ষণই ভাল। এক একবার প্রকাশের মনে হইল যে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শান্তিলাভ করে—কিন্তু সাহসে কুলাইল না। এই অসহ্য প্রতীক্ষার ভিতর একটা শঙ্কা—একটা লজ্জা ও একটা সঙ্কোচ আসিয়া—এই উন্মুখ অধৈর্য্যকে প্রতি পদে আহত করিতে লাগিল।

আজ দুই বৎসর পরে তাঁহার আদরের প্রকাশ বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যে তিনি প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে পারিতেছেন না, একখানা জগদ্দল পাথর বুকে চাপা, সেটিকে ঠেলিয়া সরাইয়া সে বিশ্বপ্লাবী স্রোত উৎসারিত হইতে পারিতেছিল না। দুগ্ধাধিক্য হেতু স্তনপীড়ার ন্যায় বেদনায় তাঁর হৃদয়খানি টনটন্ করিতে লাগিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে দুই মাস ছয় মাস অন্তর প্রকাশ যখন বাড়ী আসিয়াছে, তখন যে-জননী আনন্দের অশ্রুতে স্নেহের চুম্বনে পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ-তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, এবার কেন পারিতেছেন না,—এ কথা ভাবিয়া তিনিও যেমন কাতর, পুত্রও তাই ভাবিয়া একটা দুরন্ত অমঙ্গলের আশঙ্কায় জর্জ্জরিত। দুইজনের হৃদয়ই অভিমানে, ক্ষোভে, শঙ্কায়, লজ্জায়, কথায় পরিপূর্ণ।

মাতা পুত্রে দুইজনে নিজ নিজ মনের মত নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিয়া, শ্রাবণের মেঘমন্দ্রিত জলসিক্ত আঁধার আকাশকে নিবিড়তর করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। প্রভাতেও বর্ষণ থামিল না। পল্লীপথের ধূলিবহুল পথখানি, ঘনসন্নিবিষ্ট আম্রপনসাদির বাগান, সমতল ও পতিত ভূখণ্ড, খাল খাত প্রভৃতি সব ধূসর জলে ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে। প্রকাশ আপনার কক্ষে সম্মুখে কয়েকখানি মোটা মোটা বই খুলিয়া রাখিয়া দিয়া বাতায়নপথে বর্ষা দেখিতেছিল। সুখদা প্রকাশের প্রাতরাশের থালা হাতে করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

প্রকাশ প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া মা'র হাত হইতে খাবারের থালাটি লইয়া নিঃশব্দেই খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু তাহার মন অন্যত্র। যা' হয় একটা', যে বিষয়েই হউক না কেন, একটা কথা সে খুঁজিতে

লাগিল, যাহা বলিয়া মাকে অভিনন্দিত করে; কিন্তু একটি কথাও তাহার যোগাইল না। মাথার ভিতরে কথাগুলা সব বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা মস্ত তাল পাকাইতে লাগিল; বলিবার কথা অনেকই আছে, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। যখন অখণ্ড অবসর, অনেক বক্তব্য থাকে, তখন লোকে কিছুই বলিতে পারে না। সুযোগকে সারা সংসারটি ঘুরিতে ফিরিতে হয়, সুতরাং বেশীক্ষণ এক জায়গায় সে থাকিতে পারে না, চলিয়া যায়। সবাই যদি ঠিক সময়েই গান ধরিতে পারিত, তাহা হইলে কি আনাড়ীর সঙ্গীত বেতালা হইত?

ছেলে ভয়ে ও সঙ্কোচে নির্ব্বাক্! কিন্তু সুখদা গত রাত্রে আবার একটা মহা সমস্যা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার ভাবনা—ছেলে ত' আর কচি দুগ্ধপোষ্য বালকটি নয়, সে এখন বড় হইয়াছে, লেখা-পড়া শিখিয়াছে, বিশেষরূপে জ্ঞান বুদ্ধি হইয়াছে, এখন যদি বলার মত বলা না হয়—তাহা হইলে হয়ত হিতে বিপরীত ঘটিয়া, পুত্রটি পর্য্যন্ত হাত-ছাড়া হইয়া যাইবে। হয়, সন্ন্যাসী হইবে, নয় খ্রীষ্টান হইবে। কাজেই তাঁহার মুখভাব কাল সন্ধ্যা অপেক্ষা আজ প্রাতে অনেকটা ভাল। ঠিক করিয়াছেন, যাহা বক্তব্য তাহা খুব সংযম এবং সতর্কতার সহিত বলিতে হইবে! আঘাত করিবার সে প্রলোভন সংবৃত হইয়া মাতৃহৃদয় আবার সেবায় মন দিল। স্নেহ কি কখন ব্যথা দিতে পারে?

মা দেখিলেন, ছেলের মন খারাপ—তাই কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। ছেলে ভাবিল অন্যরূপ, কিন্তু সুযোগ হারাইয়াছে ভাবিয়া সে বেশী পস্তাইতে লাগিল। যৌবনের মত সুরা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মোহান্ধ যুবক আর এ আশঙ্কা ও সঙ্কোচ বহন করিতে পারিল

না। শিরায় শিরায় নূতন তেজে তাহার মত্ততার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেল। পানোন্মত্ত ব্যক্তি অবস্থাবিশেষে যেমন তাহার গৃহের সমস্ত আস্‌বাবপত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে—প্রকাশও তেমনি তাহার মাতৃহৃদয়ের সজ্জা-গুলি আজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর প্রকাশ জননীর নিকট যাইবার মনস্থ করিতেছে—ফিরিয়া দেখে যে, তাহারই দুয়ারে মা স্বয়ং আসিয়া হাজির। প্রকাশ জুতা পরিতেছে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও বেরুচ্ছ প্রকাশ?" প্রকাশ উগ্রভাবে উত্তর দিল—"অন্য কোথাও নয়, তোমারি কাছে যাচ্ছিলুম।" মা শান্ত নিশ্চিন্ত স্বরে বলিলেন—"কেন? এই যে আমি এসেচি, বল?"

প্রকাশ জুতা খুলিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, মা নীচে মেজেতেই বসিলেন। মিনিট দুই উভয়েই নীরব। কিন্তু প্রকাশ এবার আর সুযোগ হারাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—তাই নিজেই সুরু করিল—"এবার তোমায় এত অন্যমনস্ক কেন দেখচি, মা? আমিও কি শেষে তোমার চক্ষুশূল হলুম?" পাথর নড়িল। সুখদার দু'টি চক্ষু ভাসাইয়া দরদরধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মাকে বিগলিত এবং নীরব দেখিয়া প্রকাশের একটু ভরসা হইল, অন্তরে একটা উল্লাস শিহরিয়া উঠিল। বলিল—"টাকার জন্যে চার পাঁচখানা পত্র দিলুম, টাকা তো দূরের কথা, একটা উত্তরও কি দিতে নাই? একে তোমার এই শরীর—ভাবনা হয় না? আচ্ছা, কলিকাতায় যে পড়্‌তে পাঠিয়েচ, সেখানে কি আমার জমিদারী আছে যে মাসে মাসে টাকা আস্‌বে—তাই খরচ ক'রে থাক্‌বো? যদি টাকা খরচ কর্‌তে মায়া হয়, বল' আমি ফিরে

আস্‌চি! সারা জীবনটা না হয়, অই তোমার কেলো বাগ্দী, শ্যামা ডোম, হরিশ মোড়ল, ভূষণ দৈবকদের সঙ্গে মিশে আর পরনিন্দা পর-কুৎসা ক'রে কাটিয়ে দেব' ?"

প্রকাশের মুখ খুলিয়া গিয়াছে, বিশেষ সুখদা যখন এখনও নীরব। প্রকাশ ভাবিল, তবে সে যে সব সন্দেহ করিয়াছিল, সে সমস্ত অমূলক, তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতে লাগিল—"তিন চার মাস সময় বাজে কেটে গেল, কিছু পড়াশুনো হ'লো না, কেবল টাকার অভাবে। এবার কলেজের পড়া—সাহেবসুবোদের কাছে প'ড়্‌তে হবে—"

"বাবা, আমি কি তোমায় টাকা দিতে, পড়াতে, চেষ্টার কোন কসুর করেচি ? তুমি যে না পড়ে' না শুনে' কেবল টাকা ওড়াবে, তা' কি আমি জানি, না জান্‌তাম্ ? আমি মেয়েমানুষ হয়ে যা করেচি ক'টা পুরুষে তেমন পারে ?" সুখদা আর থাকিতে পারিলেন না তাই উত্তেজিত হইয়া কথা কয়টি প্রকাশের কথায় বাধা দিয়াই বলিয়া ফেলিলেন।

প্রকাশের মুখমণ্ডল অপরাধে, লজ্জায়, আরক্তিম হইয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। হঠাৎ উন্নত মস্তক অবনত হইয়া ঝুলিয়া পড়িল। সুখদা বলিতে লাগিলেন—"কর্ত্তা তো কুবেরের ভাণ্ডার রেখে যান নাই। এই ছয় বছরে তুমি প্রায় পনের' হাজার উড়িয়েচ, অথচ ইস্কুলে-ই যাও নাই। আমি বোকা, তাই আমায় অন্য একজনের নাম নিজের নাম বলে', বোঝালে—আমিও তাই বুঝ্‌লাম। ওমা! কেবল তুমি আমায় ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা নিয়েচ, আর উড়িয়েচ। প্রথমটা আমি লোকের কথা বিশ্বাসই কর্‌তাম না। বরং যারা বল্‌তো তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম! হাঁ, বাবা, তোমার

পেটে এত গুণ? এই যে বেহারী চক্রবর্ত্তীর সোণার চাঁদ দুই ছেলে চার্‌টে পাঁচটা করে' পাশ ক'র্‌লো— ক' লাখ টাকা তাদের বাপ খরচ ক'রেচে? আমার ত' আর শুন্‌তে কিছু বাকী নেই, বাবা—আর মিছে কথা বলে ভোলাতে চেষ্টা কোরোনা, ও সব চালাকী আর খাট্‌বে না। তোমাকে আর প'ড়্‌তে হবে না, তুমি ফিরে এসো, বিয়ে থা' কর'। গয়না গাঁটি সোনারূপো জিনিষপত্তর সব মিলিয়ে আর হাজার দুই টাকা হবে কি-না সন্দ। কেবল ঐ চারখানা গ্রাম বাকী, এখনো বাড়ী এসো ভাল ক'রে এই গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে খাটিয়ে খুটিয়ে খাও। আমার কি? ষাঠ বছর তো হ'লো—আর ক'দিন? রাখতে পার'—তোমারি থাক্‌বে, না থাকে, পথে পথে 'হাভাত হাভাত' ক'রে বেড়াবে।"

প্রকাশ দেখিল আর তর্ক বৃথা। সুতরাং কাজ হাঁসিল করিবার মত দৃঢ়স্বরে বলিল—"তুমি টাকা দেবে কিনা?"

"একটি পয়সাও না।" বলিয়া সুখদা কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন।

(৬)

জলস্রোত বাধা পায়—দ্বিগুণ বেগে ছুটে। জননী ভাবিয়াছিলেন অর্থসাহায্য না করিলেই, অর্থসাপেক্ষ কুকর্ম্ম হইতে সন্তান তাহার অনুতপ্ত অভিভূত হইয়া জননীর অঞ্চলতলে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সুখদা যখন শুনিলেন যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া দারুণ বর্ষা মাথায় পদব্রজে হতাশে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রকাশ চলিয়া গিয়াছে, তখন আর তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

যে উন্মুখ স্নেহের বেগবাহুল্য সুখদা অতি কষ্টে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন —এই অবসরে তাহা শত শত গোমুখী পথে আত্মপ্রকাশ করিল।

দুই বৎসর পরে ছেলে বাটী আসিল, তাহাকে যে অনাদৃত অচুম্বিত অনভিনন্দিত ফিরাইয়া দেওয়া হইল—এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই! প্রকাশের শত দোষ, সহস্র অপরাধ, সব মার্জ্জনীয় কারণ সে ছেলে, একমাত্র পুত্র! লোকে মোকদ্দমায় ও কন্যাদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়, চোরে ডাকাতে লুট করিয়াও কত লোককে নিঃসম্বল করে—এ তো যার টাকা, সেই খরচ করিয়াছে! এমনি করিয়া সুখদার সমস্ত প্রাণ প্রকাশের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল—কেহই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না।

গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে রাজনগর ষ্টেশন। তৎক্ষণাৎ নোটে, গিনিতে, টাকায়, নগদ এক হাজার টাকা দিয়া বাড়ীর গোমস্তা বটুক চট্টোপাধ্যায়কে সুখদা কলিকাতা পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, প্রকাশ যেন হঠাৎ রাগের মাথায় বিবাগী হইয়া না চলিয়া যায়, সেটা ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে তিনি ফিরিয়া আসেন।

প্রকাশ আহত ভুজঙ্গের মত একবার প্রাণপণ শক্তিতে তাহার সমস্ত বিষ নিঃশেষে ঢালিয়া, তাহার জননীকে দংশন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহার বিশ্বাস—তাহার পিতা কেবলমাত্র নগদ টাকাতেই অগাধ অফুরন্ত ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, ভূসম্পত্তির তো কথাই নাই। সে মাত্র পনের হাজারই খরচ করিয়াছে, যাহা সে সঞ্চিত সম্পত্তির একটা অতি ক্ষুদ্রতম অংশ বৈত নয়। ব্যয়কাতরা মা'ই কেবল যক্ষের মত সেই ভাণ্ডার আগুলিয়া বসিয়া আছে। অতএব এ প্রতিবন্ধক অপসৃত করিতেই হইবে। পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার, কার্য্যেও তাহা পূর্ণ হউক। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রকাশের মস্তিষ্ক উষ্ণতর হইতে লাগিল। তপ্ত বালির খোলার খৈ ভাজার মত লক্ষ লক্ষ কল্পনা ফুটিয়া ফুটিয়া

চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এ ভাবনার কূল নাই, সীমা নাই, লক্ষ্য নাই—কেবলি আবর্ত্ত। এই আবর্ত্তিত চিন্তাপ্রবাহ একটা চূড়ান্ত প্রতিশোধ একটা কঠোর প্রতিহিংসার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া কেবলি ঘুরপাক খাইতে লাগিল। অবিরাম ঘূর্ণনে ও অভিঘাতে চিন্তা-তরঙ্গ উল্কাপিণ্ডের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু দগ্ধ করিবার অথবা নিঃশেষ হইবার কোনও উপায়ই ছিল না।

স্থূলবুদ্ধি মর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি—তোষামোদকে সম্মান এবং স্নেহকে অপমান ভাবে। প্রকাশ তাই জননীকৃত এই অপমানে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, লজ্জিত এবং বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মাখন সমস্ত শুনিল; শুনিয়া কোনও মতামত প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রকাশ বলিল—"ভাই, এখন তোমাকে আমার একটা কায করতে হবে। অবিশ্যি আপাততঃ দু' এক মাসের খরচ এই হাজার টাকাতেই চল্‌বে, কিন্তু তারপর?"

মাখন একটু উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি? কি কায কর্‌তে হবে?"

প্রকাশ একটু নরম হইয়া বলিল—"উকিল যখন বল্‌চে যে ও-বিষয় আমার, মায়ের নয়,—তখন আর ভাবনা কি? আমি এখানে ধার ক'রে চালাবো, তারপর তাকে দিয়ে মকদ্দমা করিয়ে, তার খরচা সুদ্ধ আদায় করিয়ে দেব।"

মাখন—"তাত' হ'লো, এখন তোমায় শুধু হাতে তো আর কেউ টাকা দেবে না? কিছু মর্টগেজ চাইবে যে।"

প্রকাশ এক মুখ হাসিয়া বলিল—"সে চালও আমি চেলে রেখেচি ! বটুক চাটুয্যে যখন ঐ হাজার টাকা নিয়ে আমায় বোঝাতে আসে, তখনি আমাদের জমিদারীসংক্রান্ত সব দলিল ফলিল কাগজ টাগজ গুলো হস্তগত করে' ফেলেচি।"

মাখন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম, কি রকম ?"

প্রকাশ প্রসন্নগম্ভীরমুখে উত্তর দিল—"প্রথমতঃ গোমস্তাকে নানান্ রকম চাল দিলাম—তাতে সে ভিড়লোনা। বল্লে কাগজপত্র সিন্ধুকে বন্ধ—তার চাবীও মা'র কাছে। তার পরে তাকে ভয় দেখালাম ভরসাও দিলাম—যে আমি শীঘ্র বাড়ী গিয়ে নিজেই বিষয় দেখবো, অতএব কাগজপত্রগুলো একবার দেখার দরকার। দ্বিতীয়তঃ, তাকে এক হাজার টাকা বক্‌শিসের আশাও দিয়েচি। মা জানেন না—সে কাল আমায় কাগজপত্র সব দিয়ে গেছে।"

মাখন আশ্বাসের স্বরে বলিল—"তবে আর ভাবনা কি ?"

কলিকাতা মহানগরী—যেখানে মূল্য দিলে ব্যাঘ্রীর দুগ্ধ পাওয়া যায়, মিথ্যা সাক্ষী পাওয়া যায়, সেখানে সুদ দিলে আর টাকা মিলিবে না ? রাজেন্দ্র বাগ্‌চী প্রকাশের অন্যতম বন্ধু ফণিভূষণের পিতা—প্রকাশকে পুত্রের বন্ধু বলিয়া কিছু উচ্চহার সুদেই পাঁচটি হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়া বাধিত করিলেন। প্রকাশচন্দ্রের তাবৎ জমিদারী বন্ধক পড়িল।

(৭)

সব কাযেই পশার আছে। ওকালতী, ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারী হইতে মায় কেরাণীগিরিতে পর্য্যন্ত পশার আছে। প্রকাশের বড়লোক বলিয়া একটা খ্যাতি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পয়সার বড়ই টানাটানি।

প্রথম প্রথম ধার করিয়া এক রকম চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মহাজনেরা যখন ভদ্রতার সীমা উলঙ্ঘন করিয়া ক্রমশঃ কড়া তাগাদা আরম্ভ করিল তখনই প্রকাশ বড় বিব্রত হইয়া উঠিল। যে ধনবত্তার খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রকাশকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, সেই খ্যাতিটাই এখন তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল। এ একটা সয়তানের মত তাহাকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অভিহত করিয়াই যেন উৎকট আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। মহাজনেরা ইংরাজ-রাজত্বের শ্রেষ্ঠ কাব্য উকিলের চিঠিতে প্রকাশকে অভিনন্দন দিতে লাগিল। খাতক মহাশয় কলিকাতায় একজন নিষ্কর্ম্মা বাবু, ধার করিয়া কেবল অর্থের অপব্যয় করিতেছেন শুনিয়া, মহাজন-সম্প্রদায় একটু চঞ্চল হইয়াই নিজ নিজ হ্যাণ্ডনোট দলিল তমসুকের পানে বিষম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিলেন—সে চাহনি আসন্ন পুত্রবিয়োগবিধুরা জননীর মত স্নেহ করুণ। অর্থ নষ্ট করিতে পৃথিবীতে কেবল দুই জন বাধা দেয়। এক সহৃদয় আত্মীয় বন্ধু ও মহাজন। মা তো পূর্ব্বেই বাধা দিয়াছেন একণে কোন কোন মহাজনও আসিয়া এরূপ অযাচিত উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, এখন আর টাকা না উড়াইয়া সুদসমেত তাঁহাদের সমস্ত টাকার ঋণ-পরিশোধই প্রকাশের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রকাশ যে কি করিবে, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সে মাকড়সার মত জাল বিস্তার করিয়া যে শীকারের প্রতীক্ষা করিতেছিল—এখন তাহাতে সে নিজেই জড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

টাকা চাই, টাকা পাইবার পথ প্রশস্ত হওয়া চাই—আর সেই সঙ্গে মাকেও একটা শিক্ষা দিতে হইবে—কিন্তু কি করিয়া যে এতগুলি কার্য্য উদ্‌যাপিত হইবে, তাহার কোন উপায়ই সে করিতে পারে না। তাই ধার করে, মদ খায়, নাচে, গায়, চিৎকার করে আর সময় কাটায় অথচ সে পূর্ব্বের মত আনন্দও আর পায় না। মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কলিকাতার উপকণ্ঠে কাহারও বাগানবাড়ী ভাড়া লইয়া দুই একদিন কাটাইয়া আসে তবুও সে সুস্থ হয় না। পূর্ব্বেকার মত এখনও বাগানপার্টি, সান্ধ্য-সম্মিলন, সদলবলে থিয়েটারে গমন ভোজ সমস্ত-ই আছে—তবুও প্রকাশ যে কেন শান্তি পায় না, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

বিগত এক বৎসরের মধ্যে বাড়িতে সে একখানি পত্রও দেয় নাই—তাহাতে সুখদা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। পত্রের পর পত্র, রেজেষ্ট্রীপত্র, টেলিগ্রাম—কিছুতেই প্রকাশ যখন টলিল না, তখন স্বয়ং সশরীরে বটুক চাটুয্যে এক দিন কলিকাতায় আসিয়া হাজির। সুখদা বটুককে প্রকাশের তত্ত্ব লইতে এবং প্রকাশকে বুঝাইতে কলিকাতা পাঠাইলেন। বটুক আসিয়া আপনার পুরস্কারের অঙ্গীকৃত অর্থের তাগাদা করিয়া বাটী ফিরিয়া গেল। সুখদাকে গিয়া জানাইল যে, প্রকাশ শারীরিক ভাল আছে তবে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার অভিমান ভাঙ্গাইতে বা বাটী আনিতে সে পারিল না।

পুত্রের অভিমানে সুখদা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বেহারী চক্রবর্ত্তীর পত্নীর উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছেন, যেহেতু তাঁহার পরামর্শ শুনিয়াই এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। যে সমস্ত যুক্তি তর্ক

প্রমাণে সুখদা একদিন পুত্রকে সৎপথে ফিরাইতে বজ্রের ন্যায় কঠোর হইয়াছিলেন, আজ দেখেন সেগুলি কত অকিঞ্চিৎকর, কত তুচ্ছ, কত ছোট। আত্মগ্লানি এবং ধিক্কারে তিনি নিজের অল্পবুদ্ধিতা, অদূরদর্শিতা এবং বিশ্বাসপ্রবণতাকে নিয়ত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পুত্রের অভিমানে আপনার দৈন্যকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে তুলিতে নিজেকে এমন উত্তেজিত করিয়া ফেলিলেন যে এই অল্পদিনেই তাঁহার বার্দ্ধক্য-নমিত কৃশদুর্ব্বল তনুখানি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই; কত লোক কত বুঝায়, পুত্রের দোষ তিনি কিছুতেই আর স্বীকার করিলেন না। বটুক চাটুয্যে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে তাঁহার অবস্থাও দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। মাথাধরা, ঘুষঘুষে জ্বর, দৃষ্টিহীনতা, মন্দাগ্নি, অরুচি হইতে হইতে তিনি একবারে হঠাৎ মৃত্যুর তোরণদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন।

বটুক চাটুয্যে রাজনগর ষ্টেশন হইতে প্রকাশকে তার পাঠাইলেন যে—তোমার জননীকে যদি শেষ দেখা দেখিতে চাও, তবে কালবিলম্ব না করিয়া চলিয়া আইস।

প্রকাশ প্রথম ভাবিল, যাইবে না। শেষে দেখিল—যদি এ সময় সে উপস্থিত না থাকে তবে তো তাহার পিতার সঞ্চিত এবং জননীর যত্ন রক্ষিত যে অসীম ধনভাণ্ডার আছে, তাহা সকলে মিলিয়া লুটিয়া লইবে—তাই বাহির হইয়া পড়িল। কলিকাতা ত্যাগ করিবার আরও একটু নিগূঢ় কারণ ছিল। মহাজনেরা তাহার কলিকাতার সমস্ত সুখ একবারে বিস্বাদ করিয়া দিয়াছে। নিজের বাসায় অথবা অন্যত্রে, যেখানেই সে থাকে, সেইখানেই টাকার তাগাদা গিয়া হাজির হয়।

ইহাতে সে ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে—কলিকাতা হইতে পলাইতে পারিলেই বাঁচে।

ভাদ্রের সন্ধ্যা। সেদিন খুব গরম বলিয়া ঘরের সমস্ত দুয়ার জানালা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেঝেতে কঙ্কালসার সুখদা জীবনের জন্য মরণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; বটুকের সঙ্গে প্রকাশ ঘরে ঢুকিয়া—আস্তে আস্তে নীরবে জননীর পদতলে গিয়া বসিল।

প্রকাশকে দেখিয়া সুখদা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—তাঁহার কোটর-নিলীন চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল। আর বড় বড় অশ্রুবিন্দু অনর্গল বহিতে লাগিল। অতি কষ্টে তিনি প্রকাশের গলবেষ্টন করিয়া তাহার মাথাটিকে আপনার অস্থিসার বুকে স্থাপন করিলেন—ওষ্ঠদ্বয় স্পন্দিত হইল, রুদ্ধ কণ্ঠের তীব্র যন্ত্রণা সেই মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না। প্রকাশও মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া জননীর শেষ শয্যাকে পবিত্র এবং সুকোমল করিয়া দিল।

(৮)

শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেল, তবুও প্রকাশ কলিকাতা যাইবার নাম করে না দেখিয়া গ্রামের কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া গেল! কিন্তু যে যাইবে সে কি লইয়া যাইবে? সমস্ত বাক্স সিন্ধুক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া যাত্রার সিঁদুর মাখানো টাকা কয়টি পর্য্যন্ত গণিয়া নগদ এক হাজারও হইল না। মাত্র কয়েকখানি সোণা রূপার অলঙ্কার বেণীর ভাগ থাকিল। অথচ তাহার কলিকাতার ঋণ এদিকে সুদে আসলে প্রায় দশ হাজারে উঠিয়াছে!

প্রকাশের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। সে যে মাকে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য এ কাজ করিয়াছে—ভাবিয়া তাহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া উঠিল। কলিকাতার সমস্ত সুখ, সৌন্দর্য্য, পৃথিবীর যাবতীয় মোহ এবার সে সত্য সত্যই এক বিরাট চক্রান্তের মত দেখিল। সকলেই যেন তাহার বিরুদ্ধে নির্ম্মম জল্লাদের মত দণ্ডায়মান্। আপনার বলিতে জনমানব নাই—মাথাটি রাখিবার পর্য্যন্ত স্থান নাই। সে আজ এত দরিদ্র! প্রকাশের চক্ষে দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িল—কোন মতেই সে জলস্রোতকে সে বাধা দিতে পারিল না। নিঃস্ব, নিতান্ত নিরুপায়। আপনার মদোদ্ধত অহঙ্কার ও প্রবঞ্চনায় সে শেষে এত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে ঠিক করিল আত্মহত্যা করিবে; কিন্তু পারিল না। কোনও দিকে পলাইয়া যাইবে? সেও বড় বিষম বিড়ম্বনা। তবে কি পাওনাদারদের হাতে পায়ে ধরিবে? অগত্যা, পাওনাদারদের হাতে পায়েই ধরিতে হইবে—তাহা ভিন্ন আর উপায় কি? এ বিষয়ে পাকাপাকি একটা পরামর্শ করিতে সে মাখনকে তার করিল, যেন একদিনের জন্যও আসিয়া সে একবার সাক্ষাৎ করিয়া যায়!

মাখন আসিল। কর্ম্মে বড়ই ব্যস্ত। এইজন্য বার'টার গাড়ীতে আসিয়া, তিনটার সময় ফেরতা ট্রেণে তাহাকে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তাই প্রকাশ ষ্টেশনেই মাখনের সঙ্গে পরামর্শাদি করিবে বলিয়া ষ্টেশনে আসিল।

প্রকাশ মাখনকে পাইয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিয়া ষ্টেশনের বাহিরে একটা অশ্বত্থতলে বসিয়াই প্রকাশ আপনার বক্তব্য

বলিয়া মাখনের অভিমত চাহিল। কারণ সময় খুব অল্প, এরই মধ্যে কাজ শেষ করিতে হইবে।

প্রকাশ যে পথের ভিখারী হইয়াছে, একথা শুনিয়া মাখন পাগলের মত খুব জোরে একটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। সে হাসির শব্দেও প্রতি-ধ্বনিতে নিস্তব্ধ মাঠ চমকিয়া উঠিল,—বৃক্ষশাখার পাখীগুলি চকিত কলরোলে বৃক্ষত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল। ষ্টেশন-পথের লোকগুলি বিস্মিত হইয়া তাহাদের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রকাশ অবাক্!

মাখনের চক্ষু দিয়া একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। মাখন বলিল—"বন্ধু, তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা, আর যে কখনও সাক্ষাৎ হবে সে সম্ভাবনাও নাই। কেন যে নাই, আমার কথা শুন্‌লেই তুমি তা' বুঝ্‌তে পার্‌বে। স্থির হ'য়ে শোন'—অমন উত্তেজিত হ'য়ো না।

"মাখনলাল আমার ছদ্মনাম—আমি যতীন্দ্রনাথ রায়, স্বর্গগত সীতা-নাথ রায়ের পুত্র—নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে, শ্যামবাজার। এইবার বোধ হয় কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌চ'। শোন', আরো পরিষ্কার ক'রে বল্‌চি। তোমার পিতা রামহরি মজুমদার আমার পিতার একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁর হাতে ব্যবসাসংক্রান্ত সমস্ত কাজ কর্ম্ম টাকাকড়ি সঁপে দিয়ে আমার পিতাঠাকুর নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু তোমার বাবা শেষে আমাদের সর্ব্বনাশ করে' পথে বসিয়ে, তহবিলের সমস্ত টাকা পয়সা চুরি করে' এনে, গ্রামে একজন মস্ত বড় লোক হ'য়ে বস্‌লেন। সেই শোকে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন তিন বৎসর! এরূপ নিরুপায় নিরাশ্রয় অবস্থায় আমার দুঃখিনী মা আমাকে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ীতে

এসে তবে প্রাণরক্ষা করলেন। আমার মামারা সেই পাষণ্ডের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করবার জন্য ব্যস্ত হলেন। কিন্তু মা' তা করতে দিলেন না। মা কেবল ভগবানের হাতেই বিচারভার দিয়ে সান্ত্বনা লাভ ক'রলেন। কিন্তু বাল্যকাল হ'তেই মায়ের সেই বিষণ্ণ মুখমণ্ডল আমার সমস্ত অন্তর ও সমস্ত শক্তিকে একটা প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় অনুপ্রাণিত ক'রে রেখেছিল। এ প্রেরণা আমি অবহেলা ক'রতে পারি নাই বা করিও নাই। তোমার পিতার বিশ্বাসঘাতকতার উচ্চ সৌধকে আমি ধ্বংস করে' ভিখারীর মত তোমায় রাজপথে বের করব—এই ছিল আমার পণ। তা' হয়েচে।

"অনেক খোঁজ তল্লাস করে' আমি তোমায় আবিষ্কার করেচি। সে কথা বিস্তারিত করে' বল্‌বার বোধ হয় আর প্রয়োজন নাই।

"তোমাকে ধ্বংসপথের যাত্রী করতে আমি অনেক উপায়ই ঠিক ক'রে ছিলাম, দেখ্‌লাম তার মধ্যে তুমি সহজটাই গ্রহণ কর্‌বার উপযুক্ত। ক্ষেত্রকে উপযুক্ত করে' তুল্‌বার ভারটা আমিই নিয়েছিলাম। তোমাকে মদ ধরালাম, দিলজান্‌কে জুটিয়ে দিলাম, কলিকাতার বিখ্যাত বদমায়েস ছোক্‌রার দলকে তোমার বন্ধু জুটিয়ে দিলাম। দেখ্‌লাম নৌকা যখন পালে চলে, তখন গুন্ টান্‌বার দরকার হয় না—তাই আমি নিপুণ কর্ণধারের মত হা'ল ধরে' বসে' রইলাম। তুমি অনুকূল পবনে তর্ তর্ করে' ঘুর্ণি-পাথারের মুখে চল্‌তে লাগলে।

"তোমার সঙ্গে অনেক প্রতারণা প্রবঞ্চনা, অনেক কুকর্ম্ম করেচি। ইহকালেই হোক্ আর পরকালেই হোক তার শাস্তি হয়ত আমায় পেতে হবে। কিন্তু সে যতই কঠোর হোক্—আমার পিতার শেষ ইচ্ছা প্রতিপালনের আনন্দে ও পুত্রের গৌরবে আমি তা বরণ করে নেব'।"

ট্রেণ কখন আসিয়াছে, কাহারও সেদিকে লক্ষ্য নাই। গার্ডের গাড়ী ছাড়িবার বাঁশি শুনিয়া যতীন্দ্রের হুঁস্ হইল। সে ছুটিয়া গিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিল! দেবতার থূৎকারের মত অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া কয়লা ও ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে গাড়ী চলিয়া গেল। প্রকাশ বজ্রাহতের ন্যায় সেই অশ্বত্থতলে আবিষ্টের মত বসিয়া রহিল।

তিন চারি দিন পরেই গ্রামে ক্রোকের ঢোল বাজিল।

কবির সুবুদ্ধি

"কাব্যং করোষি কিমু তে সুহৃদো ন সন্তি
যে ত্বামুদীর্ণপবনং ন নিবারয়ন্তি।
গব্যং ঘৃতং পিব নিবাতগৃহং প্রবিশ্য
বাতাধিকা হি পুরুষাঃ কবয়ো ভবন্তি॥"—ইত্যুদ্ভটঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সরোজকান্ত বাল্যকাল হইতেই কবি। কাব্যচর্চ্চায় অত্যধিক মনোনিবেশবশতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষাটি সে আর কিছুতেই পাশ করিতে পারিল না। কয়েকবার উপর্য্যুপরি ফেল হইয়া সে লেখাপড়া ছাড়িয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিল—ভাবিল, এমনি করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিবে। ক্ষেতে ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, বাগানে তরিতরকারী ছিল, গোয়ালে দুধ ছিল, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের তাহার অভাব ছিল না। চাকরী সে করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় পর-পর তাহার দুইটি কন্যাসন্তান জন্মিল। তখন জননীর অনুরোধে, পত্নীর অনুযোগে, জ্ঞাতিপ্রতিবেশীর পরামর্শে, নিন্দুকের টিটকারিতে এবং যুগল কন্যার চিৎকারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া শেষে কবি অগত্যা চাকরী করিতেই রাজী হইল।

শুভদিনে শুভক্ষণে সরোজ কলিকাতা আসিল। চাক্‌রী অন্বেষণে তাহার তেমন কোনও ব্যগ্রতা কিন্তু দেখা গেল না; মেসের বাসায় বসিয়া বসিয়া সর্ব্বদা সে কবিতাই লিখিত। সকাল সন্ধ্যা সে কোন না কোন মাসিক-সম্পাদকের গৃহে কিম্বা আফিসে বসিয়া আড্ডা জাঁকাইত। কচিৎ কখনও খেয়াল হইলে কোনও আফিসে বেগারঠেলা গোছের এক আধবার যাইত; ঐ পর্য্যন্ত।

কলিকাতায় আসিবার বছর দেড়েক পূর্ব্ব হইতেই সরোজের কবিতা মাসিক পত্রাদিতে ছাপা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এখন "সুধা" "জননী" "শান্তি" প্রভৃতি মাসিকে তাহার কবিতা অজস্র ধারায় বাহির হইতে লাগিল।

যখনি সময় পাইত, কি নূতন কি পুরাতন মাসিকগুলি খুলিয়া সরোজ আপন কবিতার নিম্নে ছাপার হরফে নিজের নাম দেখিতে দেখিতে আনন্দে গৌরবে আশায় একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত। যে যে সংখ্যায় সরোজের কবিতা আছে, সেই সেই সংখ্যা কাগজগুলি তাহার মেসের কক্ষে ছোট টেবিলটির উপরে অথবা বিছানার উপরে সর্ব্বদা এরূপ ভাবে ছড়ান' থাকিত যে, সে ঘরে কেহ প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার নজরে পড়ে।

মেসের লোককে কবিতা শুনাইয়া, মাসিকপত্রের আপিসে আপিসে আড্ডা দিয়া সরোজ একটি বৎসর কাটাইয়া দিল, অথচ আসল কাজের কিছুই করিতে পারিল না। তাহার জননী তখন তাহাকে একখানি কড়া করিয়া পত্র লিখিলেন যে, যদি চাক্‌রী না মিলে তবে সে যেন বাড়ী ফিরিয়া আসে, কারণ তাঁহার এমন সঙ্গতি নাই, যাহা দ্বারা তিনি

নিয়মিতভাবে পুত্রকে মাসিক পনেরটি করিয়া টাকা সাহায্য করিতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁহাকে নাকি কিছু ঋণগ্রহণ করিতে হইয়াছে ইত্যাদি। এ পত্রে যখন কোন ফল ফলিল না, তখন অগত্যা তাঁহাকে টাকা বন্ধ করিতেই হইল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই মাসিক পনের টাকা পারিশ্রমিকে সরোজের একটি টিউশনি জুটিয়া গেল। মায়ের গুণগ্রাহিতার অভাবে এবং এবম্বিধ মনীষী পুত্রকে হঠাৎ বিপন্ন করায় সরোজ খুবই চটিয়া গিয়া আর বাড়ীই গেল না। চাকরীর চেষ্টায় এইবার ভাল করিয়া লাগিতে হইল—এবং "অর্থ মনর্থং" নামে অর্থের অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে একটি কবিতাও সে লিখিয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন সময়ে "মেঘমল্লার" নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র বাহির হইবে গুজব উঠিল। দেখিতে দেখিতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দৈনিক প্রভৃতি সমস্ত সংবাদপত্রে অজস্রধারে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে, ডবলক্রাউন অষ্টাংশিত মাসিক দুইশত পৃষ্ঠায়, প্রতি মাসে সাতচল্লিশখানি রং-বেরংয়ের চিত্রে এবং বঙ্গের যাবৎ শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনায় পরিপূর্ণ হইয়া "মেঘমল্লার" প্রকাশিত হইবে। লোভনীয় ও মনভুলানো ভাষায়, আইন বাঁচাইয়া যত প্রকারের মিথ্যা ও প্রব : না চলে, বিজ্ঞাপনে তাহার কোনও ত্রুটি ছিল না। সে যাহাই হউক, বিজ্ঞাপনে লেখকগণের যে ফিরিস্তি ছাপা হইয়াছিল—তাহাতে সরোজেরও নাম ছিল। যশের উন্মাদনায় সরোজ একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল।

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী কোম্পানির আফিসে ত্রিশ মুদ্রার একটি চাকরীর সম্ভাবনা সরোজের হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সপ্তাহকাল মধ্যে একবারও সেদিকে যাইবার একান্ত অবকাশাভাবে সেটি ফস্কাইয়া গেল।

অষ্টম দিনে সরোজকান্ত তাহার মসীকৃষ্ণ অংসবিলম্বী কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ দোলাইয়া, বোতাম-খোলা সার্ট গায়ে দিয়া আফিসে হাজির হইয়া শুনিল যে, তাহার অদর্শন জন্য, সে পদ সাহেব অনৈক অকবিকে দান করিয়াছেন। সে তখন ম্লানমুখে বড়বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বড়বাবু লোকটি ভাল। তিনি সসংকোচে মৃদু একটু ভৎসনা করিয়া

স্নেহপরবশ হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, যা হবার তাতো হয়ে গেছে—তার আর উপায় নাই। দেখি দাঁড়াও। আরও একটা চাকরি খালি ছিল—আমাদের আফিসে নয়, অন্য আফিসে। কিন্তু সেটা এখনও খালি আছে কিনা জানি না। যাই হোক, আমি একখানা চিঠি দিচ্ছি এখানা নিয়ে কাল বেলা দশটার সময় একবার ষ্টেড্ কোম্পানির আফিসে যেও। সেখানে সুরেনবাবু বড়বাবু, তাঁকে এই খানা দিও—যদি কাজটা খালি থাকে তো পাবে বোধ হয়।"

এই বলিয়া বড়বাবু সরোজের মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। সরোজ কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে উজ্জ্বল হাসিতে মুখমণ্ডল আরক্তিম করিয়া হাত কচলাইতে লাগিল। বড়বাবু পত্র লিখিতে লাগিলেন।

এই সময় সরোজ তাহার চতুঃপার্শ্বে একবার চাহিল। দেখিল—দূরে, অদূরে সারি সারি অগণিত যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ মাথা নত করিয়া কত কি লিখিতেছে। তাহাদের আশে পাশে কত কাগজ, কেতাব ও খাতা। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল—হায় রে কপাল, যে লেখনী কাব্যের পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বঙ্গদেশকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুরভিত করিয়া দিবে, আশা করিয়াছিলাম, সেই লেখনী এই সকল খাতাপত্রের মরুবক্ষে ক্ষয় করিতে হইবে!

চিঠি শেষ করিয়া বড়বাবু বলিলেন—"এই নাও, এই চিঠিখানা সুরেনবাবুকে দিও। (ঘড়ি পানে তাকাইয়া) আজ আর বোধ হয় হবে না—কাল বেলা দশটা এগারটার মধ্যেই যেও যেন। কি হয় আমায় একটা সংবাদ দিও।" বলিয়া বড়বাবু সরোজের হাতে পত্রখানি দিলেন।

সম্মোজ কি বলিতে গেল—কিন্তু কণ্ঠের কাছে আসিয়া কথাগুলি সব ঘুরপাক খাইতে লাগিল, মুখ দিয়া বাহির হইল না। কৃতজ্ঞতার ভাষা অনুচ্চারিত রাখিয়াই একটি ঢোক গিলিয়া, পত্রখানি লইয়া সে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেসে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। সে দিন আর কবি টিউশনি করিতে গেল না। আস্তে আস্তে বারান্দায় যেখানে মৈসিক-বন্ধুবর্গ দিবাবসানে বিশ্রম্ভালাপ অর্থাৎ নিজ নিজ অফিসের ও সাহেবদের সমালোচনা করিতেছিলেন, সরোজ আসিয়া সেইখানে উপবেশন করিল।

বিষ্ণুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কবিবর, আজ যে বড় বিমর্ষ? মনটা খারাপ, না নূতন কিছু লিখবে তাই ভাবচো?"

কবি আকাশপানে একবার উদাস চাহনি চাহিয়া ভাবুকের মত গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"না কিছু ভাবি নাই, মনটাই তেমন ভাল নাই।"

দ্বিজেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করিলেন—"কেন? কেন? বাড়ীর সব খবর ভাল তো?"

অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন—"কারু ব্যারাম-স্যারাম হয় নাই তো?"

সরোজ বলিল—"সে সব কিছু নয়। বাড়ীর সবাই ভাল আছে।"

শশধরবাবু মেসে একটু রসিক বলিয়া বিখ্যাত। তিনি কবিজায়ার বিরহই কবির হঠাৎ এই ভাব পরিবর্ত্তনের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া হো হো করিয়া নিজেই সর্ব্বাগ্রে হাসিয়া উঠিলেন।

সরোজ তখন, যাহা ব্যাপার বলিল।

এবার সমবেদনার পালা। "তাই ত" "তবে?" "না হয়—"

"মুকুন্দের অফিসে" প্রভৃতি অসম্পূর্ণ বাক্য দ্বারা সকলে আপন আপন দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

এটি "অফিসারস্ মেস্।" সুতরাং রাত্রি আটটা বাজিতে না বাজিতেই ভৃত্য রামচরণ হাঁক পাড়িল "বাবু রসুই তৈয়ারী।" অমনি সকলেই আপন আপন লেবু ঘৃত চিনি আচার লণ্ঠন গামছা প্রভৃতি মেস-বহির্ভূত বহুবিধ খাদ্য ও অখাদ্য দ্রব্যের সরঞ্জাম লইয়া নিম্নতলে সশব্দে সদলে অবতরণ করিয়া এক একখানি করিয়া আসন লইয়া বসিয়া গেল।

পরদিন যথাসময়ে সরোজ ষ্টেড্ কোম্পানীর অফিসে গিয়া হাজিরা দিল।

চাপরাশিদিগের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সরোজ একেবারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বড়বাবুর সম্মুখে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

বাবুটির নাম সুরেন্দ্রনাথ দে, জাতিতে তিলি। অপরিচিতের নিকট হইতে প্রথমেই নমস্কার লাভ করিয়া এবং তৎসঙ্গে একখানি পত্র পাইয়া তাঁহার মনটা অকস্মাৎ একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। পত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া নিতান্ত বড়বাবুর ধাঁচে মুরুব্বীয়ানার চা'লে তিনি সরোজকে অনেকক্ষণ যাবৎ একটি বক্তৃতা দিলেন। সরোজ নিরুপায় চাকরীর উমেদার, সুতরাং শুনিতে বাধ্য—শুনিলও তাই।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি সরোজকে সম্মুখের খালি চেয়ারখানি দেখাইয়া বসিতে বলিয়া, গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনও দরখাস্ত-টরখাস্ত এনেচ?"

সরোজ অপ্রতিভ হইয়া কাতর স্বরে জানাইল—"আজ্ঞে না, তবে যদি অনুমতি করেন এবং কোনও আশা থাকে তো—এখানে বসেই লিখে দিতে পারি।"

বড়বাবু চশমা জোড়াটি নামাইয়া রাখিয়া, একবার এদিক ওদিক চাহিয়া সম্মুখস্থ একসারি লিখননিরত কেরাণীবর্গের পানে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া বলিলেন—

"তুমি তো বাপু তবু এণ্ট্রেন্স ফেল্ করেচ; আর ঐ যে সব গাধার দল—ফার্ষ্টবুকের এঁড়ে গরুর গল্প পর্য্যন্ত বিদ্যে, ওদিকে তবে ঢোকালাম কি ক'রে? সবাই এসে আমাকেই ধরে' পড়ে। আরে একি আমার বাবার আপিস? তা' কিছুতেই কেউ শুন্‌বে না। সাহেব আমার কথাটথা একটু আধটু শোনেন কি-না—ঐ হয়েচে আমার বিপদ। কি কুক্ষণেই বড়বাবু হয়েছিলাম।"

সরোজ নীরবে অধোমুখে শুনিতেছিল।

বড়বাবু কিয়ৎক্ষণ উত্তরের প্রত্যাশায় সরোজের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; শেষে নিজেই আবার প্রশ্ন করিলেন—"তুমি হরিপদকে পাকড়ালে কোথা? সে বড় ভাল ছেলে।"

সরোজ বিনয়-সঙ্কুচিতস্বরে বলিল—"তাঁর আপিসেই। তিনি নিজে হতেই দয়া করে' আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েচেন।"

বড়বাবু ঈষৎ বক্র হাসি হাসিয়া বলিলেন—"দয়া করে' চিঠি দেওয়ার চেয়ে একটা চাক্‌রী দিলে যে বেশী দয়া করা হতো। আমার কাছে কেন তবে?"

হঠাৎ সরোজের মাথা খুলিয়া গেল। সে ভাবিল—কবিতা লিখিয়া কাগজে ত ছাপাইয়াছি অনেক, একটু মৌখিক প্রয়োগ করিয়া দেখি না। তাই সে বলিল—"এখন আপনার দয়া। তরুতল আশ্রয় কর্‌তে গেলে লোকে বটগাছই ত খোঁজে।"

সুরেন্দ্রবাবু এ কথা শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ হইতেই সুরেন্দ্রবাবু এইরূপ মিষ্ট কথায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শেষে বলিলেন—"আমাকে বুঝি বটগাছ ঠাওরালে? আচ্ছা তুমি একটা দরখাস্ত লিখে ফেল' দিকিন্, দেখি একবার চেষ্টাবেষ্টা ক'রে। (কিয়ৎক্ষণ মুদিতনয়নে চিন্তা করিয়া) খালি একটা আছে! হাঁ আছে, আছে।" বলিয়া দেরাজ হইতে একখানি শাদা কাগজ ও দোয়াত কলমটি সরোজের পানে আগাইয়া দিলেন।

সরোজ তাহার জ্ঞানমত একখানি দরখাস্ত লিখিয়া বড়বাবুকে দেখিতে দিল। তিনি সেখানি পড়িয়াই শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"বাপ্‌রে বাপ্! ক'রেচ কি হে? এই কি দরখাস্তের ইংরিজি? দরখাস্ত লিখ্‌তে জান না? এ রকম করে' লেখে কা'রা? বড় বড় সাহেব, বড় বড় সাহেবেদিকে এ ভাবে লেখে। বাঙ্গালীদের কি এ ভাবে লেখা শোভা পায়? বিশেষতঃ চাক্‌রী কর্‌তে এসে?"

সরোজ হতভম্ব হইয়া বড়বাবুর মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"নাও লেখ, পাঠ লেখ Most respected Sir, আর you গুলো সব কেটে লেখ Your Honour আর শেষে লেখ for which act of kindness I shall ever pray for Your Honour's long life, health, wealth, progeny and prosperity, ব্যস, তা' হলেই হবে, আর কোনও ভুল টুল্ নেই।"

সরোজ, অন্নচিন্তা প্রবল বলিয়া আর ব্যাকরণ বা লিখনপদ্ধতির বিষয়ে কোন দ্বিধা না করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ ভাষায় একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিল।

চশ্‌মাজোড়াটি মুছিয়া, চাপ্‌কান ঝাড়িয়া, বড়বাবু দরখাস্তখানি হস্তে করিয়া সাহেব সন্দর্শনে গেলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সাহেবের খাস্‌কাম্‌রায় সরোজের ডাক পড়িল। তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। গোটাকয়েক ঢোক গিলিয়া, একটু কাসিয়া সাহেবের সম্মুখে আসিয়াই কবি আকব্বরীগজি এক দীর্ঘ সেলাম ঠুকিল। সাহেবের প্রতি প্রশ্নের উত্তরেই সরোজ Sir এবং Your Honour বলিল। সাহেব সরোজের বিনয় ও নম্র ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বড়বাবুকে বলিলেন

"I think he will do"—

সেই দিনই সরোজ মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে এক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মেসে ফিরিল। মেসের বন্ধুগণ ভোজের হিসাব করিতে বসিয়া গেল।

জননীর উপর সরোজের আর অভিমান রহিল না—খুব আহ্লাদ করিয়া তাঁহাকে সে এক পত্র লিখিল। কবিপ্রিয়াও প্রিয়ের পত্রে বঞ্চিত হইলেন না। বহুদিন হইতেই পত্নীকে কবিতায় পত্র লিখিবার সরোজের এক প্রবল সাধ ছিল; কিন্তু প্রবাসের অভাবে ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়া উঠে নাই, কলিকাতা আসিয়া তাহার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু আজ আনন্দের আতিশয্যে আর কবিতা যোগাইল না বলিয়া পদ্যময়ী গদ্য ভাষাতেই কায সারিল।

সরোজকান্ত চাকরী আরম্ভ করিল। এখন আর তাহার বিশৃঙ্খলতা নাই, আহারনিদ্রায় অনিয়ম নাই, আফিস যাওয়া আসাতেও ক্লান্তি বা বিরক্তি নাই। কবিসুলভ এলোমেলো কার্য্যকলাপগুলি হঠাৎ একেবারে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে যুক্ত ও সু-নিয়ন্ত্রিত হইয়া গেল।

মেসে ও আপিসের জল-খাবারের ঘরে বাবুদের, কে কবে বড় সাহেবের খাস্ আর্দ্দালিকে ধমক দিয়াছেন, কার ড্রাফ্‌ট সাহেব না পরিবর্ত্তন করিয়া সহি করিয়াছিলেন, সেখানে অনুপস্থিত কোন্ বাবুকে কবে সাহেব গালি দিয়াছেন, প্রভৃতি বিষয়ের সমালোচনাতেও সরোজ ক্রমশঃ যোগ দিতে আরম্ভ করিল।

চাক্‌রী হইয়া তাহার কবিতা রচনা ত কমিল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গেল। সকল কাগজেই সে কবিতা পাঠাইতে লাগিল—ছাপাও হইতে লাগিল। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল, যদি কেহ বাজি রাখিয়া, কবি সরোজকান্তের কবিতা আছে বলিয়া বিখ্যাত কুখ্যাত অবিখ্যাত কোনও একটি মাসিকপত্র খুলিত, তবে তাহার বাজি হারিবার কোনও আশঙ্কাই থাকিত না।

এক বৎসর কাটিয়া গেল—সরোজের পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া চল্লিশ হইল। এই অল্পদিনের মধ্যেই সরোজকে সাহেব একটু অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। কাজেই তাহার প্রতি বড়বাবুরও স্নেহ বৃদ্ধি হইল। অন্যান্য বাবুদের দরখাস্ত কৈফিয়ৎ প্রভৃতি লিখিয়া দিত বলিয়া তাহারাও সরোজকে খাতির করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া সে যে একজন কবি, মাসিকপত্রে তাহার রচনা ছাপা হয়, এজন্যও সরোজের প্রতি সকলের একটু সম্ভ্রম ভাব দেখা যাইত। কোন কোন বাবু সওদাগরী আফিসের কায বন্ধ রাখিয়াও তাহার কাছে আসিয়া বসিতেন, কিছু কিছু কাব্যালোচনাও করিতেন। মেজাজটা ভাল থাকিলে বড়বাবু বলিতেন— "দেখো সরোজ, লেজার বইয়ে যেন 'আমায় দে মা তবিলদারী' লিখে ফেলো না।" বড়বাবু এই রসিকতাটুকুকে খুবই মূল্যবান্ মনে

করিতেন। সে যাহাই হউক সরোজ ইহাতে বেশ খুসীই থাকিত, এবং হাসিমুখেই আপিসের কায করিত।

এক বৎসরকাল অজস্র ধারে "মেঘমল্লারে" স্থান পূরাইবার কবিতা সরবরাহ করায় বর্ষশেষে কাগজের কর্ত্তৃপক্ষেরা সরোজকে কিছু পারিশ্রমিক দিলেন। বাড়ীতে মাসে মাসে পনের বিশ টাকা সাহায্য করিয়াও সরোজ নিজের কাছে কিছু জমাইয়াছিল। এইবার তাহার চির জীবনের একটি সাধ পূর্ণ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল। সেটি গ্রন্থকার হওয়া। বন্ধুবর্গের মধ্যে যাঁহাদের মানবচরিত্র-জ্ঞান আছে, তাঁহারা উৎসাহই দিলেন। যাঁহারা সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ—তাঁহারাই কেবল বই ছাপাইতে নিষেধ করিলেন; সরোজ তাঁহাদের সহিত মহাতর্ক জুড়িয়া দিল।

বন্ধু বলিলেন—"এই আক্রাগণ্ডার দিন, দুই দুইটি আবার মেয়ে আছে বল্‌চ', কেন মিছিমিছি কতকগুলো টাকা বরবাদ কর্‌বে?"

সরোজ বলিল—"বই যদি বিক্রী হয়, তো টাকা উঠ্‌তে ক'দিন?"

বন্ধু বলিলেন—"বিক্রী হলে তো? একে তো এ দেশের লোকে বই পড়ে' না। যদি পড়ে' তো দু' একখানা চুটকি চাট্‌কী উপন্যাস—তাও আবার চেয়ে ভিক্ষে করে। তোমার এ হচ্ছে কবিতার বই, ও তো কেউ চেয়ে পড়া দূরে থাক—অম্‌নি পেলেও পড়্‌বে না।"

সরোজ রাগিয়া বলিল—"থাক্, ও কথায় আর কায নাই। বই আমি ছাপাবই।"

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপিত হইল যে, অমুক অমুক মাসিক পত্রের নিয়মিত লেখক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুকবি শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত সেনের অভিনব

কাব্য "মোতির মালা"—এবার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার। ভাবে ও ভাষায় অতুল্য, কাব্যে ও কল্পনায় অমূল্য, বঙ্গসাহিত্যের অভিনব সম্পদ। গ্রন্থকারের চিত্রশোভিত—মূল্য এক টাকা।

সরোজের ধারণা বইয়ের কাট্‌তি বিজ্ঞাপনের বাহুল্য ও আড়ম্বরের উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া যাহার কবিতা লোকে এত ভালবাসে তাহার কবিতাগ্রন্থ তো লোকে কিনিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়া আছে।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর হইতেই সরোজ ভাবিতে লাগিল যে, হয়ত গুরুদাস বাবুর দোকানে শত শত অর্ডার আসিয়া জমিয়াছে। প্রেস শীঘ্র ছাপিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার মনে বড়ই অশান্তি উপস্থিত হইল। সকাল-সন্ধ্যা কবি স্বয়ং প্রেসে গিয়া ধন্না দেওয়া আরম্ভ করিল। যে যে ফর্ম্মা ছাপা হইল—সেই সেই ফাইলগুলি কবির পকেটে পকেটেই পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। পরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত, অপরিচিত যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই ফাইলগুলি দেখাইয়া জানাইল যে অচিরে একখণ্ড "মোতির মালা" তাঁহার হস্তগত হইবেই হইবে।

"মোতির মালা" ছাপা হইয়া যেমন প্রস্তুত হইল, অমনি অপরিসীম আনন্দে ও উৎসাহে একটি ঝাঁকামুটের মাথায় একশতখানি পুস্তক চাপাইয়া দোকানে দোকানে দিবার জন্য সরোজ বাহির হইল।

ভাদ্র মাস। বৃষ্টির নামগন্ধ নাই, বিষম গুমোট। বেলা তিনটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তেরটি দোকানে সরোজ মাত্র ২৫ খানি পুস্তক গছাইতে পারিল। স্থানাভাব জন্য প্রায় সকল পুস্তক-বিক্রেতাই পুস্তক রাখিতে অস্বীকার করিল। কেহ কেহ বই তো রাখিলই না,

অধিকন্তু তাহাকে খুনখারাবী জালজুয়াচুরিওয়ালা একখানা রগ্ রগে গোছের ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস লিখিতেও উপদেশ দিল।

রাত্রি ৮টার সময়ে ৭৫ খানি বহি লইয়া মুখখানি মলিন করিয়া কবি মেসে ফিরিলেন। মুটিয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পরে চুক্তির দ্বিগুণ পারিশ্রমিকেও অসন্তুষ্ট হইয়া নিষ্ক্রমণ করিল।

তথাপি সরোজ দমিল না। ভাবিল যখন কাগজে কাগজে উচ্চ সমালোচনা বাহির হইবে, নানা পদস্থব্যক্তির অভিমত সম্বলিত বিজ্ঞাপন বাহির হইবে তখন এই প্রত্যাখানকারী মূঢ় পুস্তকবিক্রেতার দল উপযাচক হইয়া পুস্তক লইতে আসিবে, সেই সময়ে এ অপমানের প্রতিশোধ সে লইবেই। বই দিতে চাহিবে না—অনেক কাকুতিমিনতির পরে তবে দিবে, তাও অত্যন্ত অল্প কমিশনে।

সেই রাত্রি হইতেই প্রায় মাসাধিককাল পর্য্যন্ত সরোজ বাঙ্গলার সমস্ত মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রে "সমালোচনার্থ" প্রায় ১০০ কাপি "মোতির মালা" পাঠাইল। প্রায় দুইশত খণ্ড পুস্তক "বন্ধুবরেষু" হইল। মেসের ও আফিসের বন্ধুবর্গ কেহই এক একখানি "মোতির মালা" লাভে বঞ্চিত রহিলেন না।

বাসার নীচের তলে একটা অব্যবহার্য্য স্যাঁৎসেতে খালি ঘর পড়িয়া ছিল। মেস্‌বাসিগণের অনুমতিক্রমে, সাড়ে তিন টাকায় একখানি তক্তাপোষ কিনিয়া সরোজ সেই ঘরে বাকী সাতশত পুস্তক সাজাইয়া রাখিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল।

প্রথম প্রথম সরোজ পুস্তকবিক্রেতাদিগের নিকট এত ঘন ঘ-

যাতায়াত আরম্ভ করিল যে, তাহারা অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিল। এবম্বিধ তাগিদের দৌরাত্ম্যে কেহ কেহ শতকরা ত্রিশ টাকা কমিশনের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও বই ফেরৎ দিতে চাহিল। সেই জন্য সরোজ আর বড় সেদিকে যায় না—কি জানি যদি আবার বহি ফেরৎ দিতে চায়?

বিক্রেতাগণের হিসাবে জানা গেল সর্ব্বসাকুল্যে মাত্র দুইখানি পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে। এতদিনে সরোজ যথার্থই আশাভঙ্গ হইল। পাঠক সম্প্রদায়ের এই কাব্যরসজ্ঞতার অভাবে এবং নিদারুণ মূর্খতায় সরোজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটার উপরেই একেবারে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল। তাহার প্রধান আপশোষ—"বাঙ্গালী আমায় চিন্‌লে না! বাঙ্গলা দেশে জন্মেচি বলেই আমার আদর হলো না।"

এদিকে সমালোচনার্থ যে সকল মাসিকপত্রে পুস্তক প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশেই "মোতির মালা"র উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল। সে সকল সমালোচনা পড়িয়া সরোজকান্তের বুক দশ হাত হইল।

আষাঢ়ের নব মেঘসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সরোজের আবার কাব্য প্রকাশের উৎকট অভিলাষ জাগিয়া উঠিল। কিন্তু অর্থাভাবে এবার আর সে বাসনা ততটা প্রবল হইবার সুবিধা পাইল না। তথাপি সে ভাবিল—হাজার না ছাপাইয়া বরং পাঁচশো কপি বহি ছাপা যাউক। এমন দিনে ইউরোপে মহাসমর বাধিয়া গেল।

ব্যবসায়ে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। জাহাজ আর আসে না। কাগজ যাহা দেশে মজুত ছিল—তাহা অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিল। বাঙ্গলা-

সাহিত্যের সম্পদ বাড়াইতে কাগজের রীম দ্বিগুণ দরেও হু হু করিয়া কাট্‌তি হইয়া গেল। পূর্ব্বকাব্যের গতি নিরীক্ষণ করিয়া সরোজ পিছাইল। এতদ্বারা বাঙ্গলা-সাহিত্যের লাভ হইল কি লোকসান্‌ হইল, তাহা সমালোচকগণই ভাল বলিতে পারেন।

সরকারী ও বেসরকারী আফিসের কর্ম্মচারী এবং সমগ্র ভারতের অধিবাসিগণ সাধ্যমত যখন যুদ্ধভাণ্ডারে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, সরোজও তখন পাঁচ টাকা চাঁদা সহি করিল। সরোজ পূর্ব্বে কখনও সংবাদপত্র পড়িত না, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি সে সংবাদপত্রের একজন একান্ত অনুরক্ত পাঠক হইয়া পড়িল। তাহার তখন একমাত্র চিন্তা—বোধ হয় সাম্রাজ্যাধিপতি যুদ্ধলিপ্ত সম্রাটের অপেক্ষাও প্রবল চিন্তা—এ যুদ্ধ কবে শেষ হয়। কারণ শেষ না হইলে আর কাগজ দেশে আসিতে পারিতেছে না।

নানা দেশের রাজা মহারাজা ধনী বণিকগণ শিবিরোপযোগী সামগ্রীসম্ভার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। নারীরা আহত সৈনিক-বর্গের জন্য ব্যাণ্ডেজ, যোদ্ধাদের জন্য পায়জামা, তোয়ালে প্রভৃতি আবশ্যকীয় বস্তুগুলি নিজে তৈরি করিয়া পাঠাইতেছেন। ধনিগণ কেহ সিগারেট, কেহ দেশলাই, কেহ খাদ্য পাঠাইয়া চরিতার্থ হইতেছে। সরোজ বলিল যে, তাহার ইচ্ছা সেও তাহার হাতের নির্ম্মিত কোনও জিনিষ পাঠায়।

কালীবাবু বলিলেন—"তুমি তোমার বইগুলি পাঠাও, আর কি পাঠাবে?" সকলে হাসিয়াই আকুল। কবি বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া সরোজ এই কথায় মনে মনে হাসিতেছিল। হঠাৎ সে এক ফন্দী ঠাওরাইল। কাহাকেও কিছু বলিল না বা কাহারও নিকট কোন পরামর্শও চাহিল না।

পরদিন আফিসে বড় সাহেবকে গিয়া সরোজ জানাইল যে সে একজন গ্রন্থকার, কবিহিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার নামও কিছু আছে। সে এই যুদ্ধে আরও কিছু সাহায্য করিতে চাহে। তাহার অবিক্রীত প্রায় ৭০০ কপি কাব্যগ্রন্থ সে যুদ্ধের জন্ম দান করিতে প্রস্তুত।

সাহেব চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে একটু হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা ত' বাঙ্গালা জানে না—তোমার বই তারা পড়্‌তেই পারবে না।"

সরোজ একটু সলজ্জভাবে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল—"বই যাবে না, যাবে টাকাই যদি সাহেবের Honour এদিকে একটু নেকনজর দেন্ তো—"

সাহেব বাধা দিয়া উল্লসিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"টাকা? টাকা কি করে হবে?"

সরোজ সবিনয়ে নিবেদন করিল—"হুজুর যদি হুকুম দেন তো আমাদের আফিসের সকলেই এক একখানি করে বই কিনতে বাধ্য হবে। এ আফিসে যা বিক্রী হবার হবে, বাকীগুলি যদি হুজুর অন্য হাউসের বড় সাহেবদের বলে তাঁদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে চালিয়ে দেন—তা হ'লে আর বিক্রী হ'তে কতক্ষণ? এক টাকা দাম বইতো নয়—তা সবাই দিতে পারবে, বিশেষ, এমন সৎকার্য্যের জন্ম। তার উপর আবার বড় সাহেবের হুকুম।"

সাহেবের মুখ খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সোল্লাসে টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন—"অতি চমৎকার কথা! এ আমি নিশ্চয়ই কর্‌বো। Capital idea, I must do it।"

বড়বাবুর ডাক পড়িল। বড়বাবুকে আদেশ দিলেন যে—এ মাসের বেতন বিলির সময় প্রত্যেক কর্ম্মচারীই যেন একটাকা দিয়া সরোজের বহি একখানি কেনে—এ টাকা ওয়ার রিলীফ্‌ ফণ্ডে যাইবে। কোনও কর্ম্মচারী যদি কিনিতে আপত্তি করে, তবে তাহার নাম যেন সাহেবকে তৎক্ষণাৎ জানান হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যে যে দোকানে "মোতির মালা" ছিল, সরোজ কয়দিন যাবৎ তত্তৎ দোকানে ঘুরিয়া, দোকানদারদিগকে আশাতীতরূপে বিস্মিত করিয়া দিয়া বইগুলি ফেরৎ আনিয়া বাসায় রাখিয়াছিল। ফেরৎ আনিবার সময় সরোজ তাহাদিগকে ইচ্ছা করিয়াই দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া ও চড়া মেজাজ দেখাইয়া আত্মতৃপ্তির সুযোগ ছাড়ে নাই। দোকানদারগণ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসকারদের এরূপ রক্তচক্ষু মধ্যে মধ্যে দেখিতে পায়, কিন্তু কবিতাগ্রন্থের লেখক যে উক্তরূপে জোর করিয়া বই ফিরাইয়া লইয়া যায়—ইহা তাহাদের নিকট একেবারে স্বপ্নাতীত নূতন বলিয়াই অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিল।

যথাসময়ে বেতন বাঁটিবার দিন আসিল। আফিসে অন্য কোনও বাবুর আসিবার আগে হইতেই সরোজ তাহার কাব্যগ্রন্থগুলি আনাইয়া বড়বাবুর টেবিলের নিকট স্তূপীকৃত করিল। সাতশো "মতির মালা"য় ঘরে 'ন স্থানং তিল ধারণং'।

সাহেবও সেদিন অপেক্ষাকৃত সকালেই আফিসে পদার্পণ করিলেন। সরোজ বারান্দাতেই ঘুরিতেছিল। সাহেব যেমন গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন, অমনি তাঁহাকে ধরণীসমান্তরাল-মেরুদণ্ডে সরোজ এক সেলাম দিল। সাহেব কবির পৃষ্ঠ চাপ্‌ড়াইয়া শুভ-প্রভাতের প্রতিদান দিলেন।

আফিসের সব বাবুই একখণ্ড করিয়া "মোতির মালা" ক্রয় করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এতদিন যে সরোজকে সকলে সাধারণ মনুষ্যস্তর হইতে একটা উচ্চতর জীব বলিয়া প্রশংসা করিতেন এবং "মোতির মালা" উপহার পাইয়া যে কাব্যের শতমুখে গুণগান করিয়াছেন—আজ তাঁহারাই সেই কাব্যের উপরে আচম্বিতে কেমন যেন বিরূপ হইয়া পড়িলেন। ক্রেতাদের মুখ অকস্মাৎ ম্লান হইয়া গেল।

বৃদ্ধ খাজাঞ্চিবাবুর মুখটিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অপ্রসন্ন, কারণ তাঁহাকে কোন্ আফিসে কত বই পাঠাইতে হইবে, কোথা হইতে কত টাকা আসিল, কত বাকী, প্রভৃতির হিসাবের জন্য আর একটি নূতন বহি খুলিতে হইল। কাজ বাড়িল—কিন্তু দু'পয়সা পাইবারও কোন আশা নাই।

এদিকে সপ্তাহকাল হইতে প্রায় প্রত্যহই দেখা যাইতেছে যে বেলা পাঁচটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আফিস ফেরতা অধিকাংশ বাবুই এক একখণ্ড "মোতির মালা" হস্তে গৃহে ফিরিতেছে।

অচিরেই কলিকাতা সহরে গুজব উঠিয়া গেল "মতির মালা" নামক একখানি কবিতাগ্রন্থের আজকাল খুব চল্‌তি। গ্রন্থকারগণ, ক্রমশ পুস্তকবিক্রেতাগণও এই ধারণার বশবর্ত্তী হইলেন। নবস্থাপিত পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক "দত্ত কোম্পানী" আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহারা খোঁজখবর করিয়া জানিলেন যে "মোতির মালা" প্রণেতা কবি সরোজকান্ত ১৮নং বেণেটোলা লেনে মেসের বাসায় বাস করেন।

পরদিন স্বয়ং দত্ত মহাশয় বেণেটোলায় কবি সন্দর্শনে আসিলেন।

নানা কথাপ্রসঙ্গে ও কবির সুখ্যাতির সূত্রে তিনি তাঁহাদের ব্যয়ে সরোজের একখানি কাব্য প্রকাশের আগ্রহ জ্ঞাপন করিলেন। সরোজ মনে মনে হাসিয়া অনেক অনিচ্ছার ভান দেখাইয়া শেষে স্বীকার করিল। তিনদিনের মধ্যেই কাপি পাইবার প্রতিশ্রুতি লইয়া দত্ত মহাশয় বিজয়-উল্লাসে বিদায় লইলেন।

একমাসের মধ্যেই কাব্য বাহির হইল। ইহার নাম—"উপচার", মূল্য এক টাকা। বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিবার জন্য প্রকাশকদের নিকট হইতে মাত্র পঞ্চাশখানি পুস্তক সরোজ পাইল; সেগুলি যথারীতি "বন্ধুবরেষু" হইল।

ছয় মাস কাটিয়া গেল। কিন্তু তিনখানির বেশী "উপচার" বিক্রয় হইল না দেখিয়া দত্ত মহাশয় অত্যন্ত দমিয়া গেলেন।

আবার একদিন দত্ত মহাশয় বেনেটোলার বাসায় উপস্থিত। মুখখানি তাঁহার আজ অত্যন্ত ম্লান, নিতান্ত বিপন্নের মত দেখাইতেছিল। তিনি প্রস্তাব করিলেন, খরচ উঠিয়া গেলে লভ্যাংশের শতকরা ত্রিশ টাকা তিনি পাইবেন বাকী টাকা গ্রন্থকার পাইবেন, এই মর্ম্মে যে চুক্তি পত্র হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি শতকরা পনেরো টাকা মাত্র লইতে প্রস্তুত—যদি সরোজ প্রকাশ ব্যয়ের অর্দ্ধেক টাকাটা এখন তাঁহাকে নগদ দেয়। তাঁহাদের নূতন কারবার, এত টাকা লোকসানে সর্ব্বনাশ হইতে পারে প্রভৃতি অজুহাত দেখাইয়া বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় কবির করুণার উদ্রেক করিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন। আজ আর সরোজ হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে টাকা দিতে তো স্বীকৃত হইলই না, বরং শাণিত বিদ্রূপের বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। দত্ত

মহাশয় নিজ মান নিজের কাছে বিবেচনা করিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেলেন।

* * * *

সরোজের এই মহনীয় রাজভক্তি ও সর্ব্বানুকরণীয় ত্যাগ স্বীকারের বার্ত্তা বর্ণনা করিয়া সাহেব বিলাতের বড় আফিসে লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আফিসে এবং সরোজকেও স্বতন্ত্র এক পত্র দিয়াছেন। সরোজের একশত টাকা বেতনে পদোন্নতি হইল।

সরোজ এখন মেস ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া "ফ্যামিলি" লইয়া আসিয়াছে। জননী বাড়ীতে আছেন।

মাহিনা বৃদ্ধির প্রীতিভোজে নানা বাক্যালাপের মধ্যে জনৈক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ সরোজ বাবুর পদ্যটদ্য আর কাগজে দেখি না যে? লেখা ছেড়ে দিলেন নাকি?"

সরোজ হাঃ হাঃ করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল—"নাঃ, সে সব ব্যারাম ভাল হ'য়ে গেছে। আমার বিশ্বাস ম্যালেরিয়ায় দেশের যতটা না ক্ষতি হয়েচে, তার বেশী অনিষ্ট করেচে ঐ মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা।"

সম্পাদকের পূর্ব্বে সরোজ সম্পূর্ণ অমূলক বিশেষ আত্মীয়তা সূচক একটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল; আমরা বাহুল্যভয়ে সেটি আর লিপিবদ্ধ করিলাম না।

অসহযোগী

—:o:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

"এত ভীড় কিসের হারাধন? এত ভীড় কিসের?" এই বলিয়া পাঁচুলাল হারাধন মিস্ত্রীর দোকানের সামনের জনতা ঠেলিয়া একেবারে হারাধনের দোকান ঘরের মেঝেয় গিয়া দাঁড়াইল।

বর্ত্তমান মির্জ্জাপুর পার্কের উত্তর-পশ্চিম কোণে হারাধনের কাঠের দোকান। হারাধন ছাত্রমহলে সুপরিচিত, কারণ তাহারি দোকানের কেওড়া কাঠের তক্তাপোষ সব ছাত্রেরা বেশী পছন্দ করিত। হারাধনও এই কারণে ছাত্রগণের সকলের নাম না জানিলেও মুখ চিনিত। কিন্তু পাঁচুলালকে সে ভাল করিয়াই চিনিত। কারণ পাঁচুর দাদা কলিকাতার বিখ্যাত ঠিকাদার ও অর্ডার সাপ্লায়ার হরলাল চট্টোপাধ্যায় এই হারাধনের দোকান হইতেই, কাঠ-কাঠরার সব জিনিষ তৈরী করাইতেন। এই জন্য সে পাঁচুদের বৈঠকখানা গলিস্থ বাড়ীটি পর্য্যন্ত চিনিত। আর পাঁচুকে সে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করিত, তাহার কারণ পাঁচু এম্-এ পাশ করিয়া হাকিম হইয়াছিল; এখন নন্-কো-অপারেশন্ (অসহযোগ) নীতিতে দীক্ষিত হইয়া হাকিমী পদে ইস্তফা দিয়া, খদ্দর পরিয়া পথে পথে খদ্দর ফেরি করে এবং দুইবার ভলাণ্টিয়ার দলের কাপ্তেন হওয়ায় জেলও খাটিয়াছে—তবু "স্বদেশী" ছাড়ে নাই। কাজেই পাঁচুকে আসিতে দেখিয়া হারাধন অকূলে কূল পাইল ও মহাসমাদরে আহ্বান করিল—

"আসুন্, আসুন্ দাদাবাবু। এই দিকে আসুন, এই দিকে আসুন—এই টুলটায় বসুন। এই সব সর'—সর'।"

লোকজন একটু নড়িল মাত্র, কিন্তু কেহই সরিল না, বরং আরও ঝুঁকিয়া পড়িল।

পাঁচুলাল ভিতরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কেবল বিহ্বলের মত ইহার উহার মুখপানে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিতে লাগিল। কেহই কিছু বলিতে পারিল না।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, পাঁচু হারাধনকে জিজ্ঞাসা করিল "কি ব্যাপারটা বল তো হারাধন। আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। এ মেয়েটি কে? এখানেই বা এল কি করে? কেই বা একে মারলে?"

এতক্ষণে সাহস পাইয়া হারাধন শিশুর মত উচ্চৈঃস্বরে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পাঁচু তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"চেঁচিয়ে কেঁদে কোনও ফল হবে কি? কি কি, ব্যাপারটাই একবার আমায় খোলাসা করে বল না ছাই। একে কি তুমি-ই মেরেচ নাকি?—"

"সেকি দাদাবাবু, আমি মার্‌ব কি! আমি কি কিছু জানি? দোকান বন্ধ কর্‌ব বলে' ঐ পাল্কিখানা ঘরে তুল্‌তে গিয়েই যত মুস্কিল বাধল। আমি গরীব মানুষ হুজুর, আমি কি জানি!"

একটি ফুট্‌ফুটে মেয়ে, বয়স প্রায় তের-চৌদ্দ বছর, রক্তাক্ত কলেবরে মৃতের মত মেঝেয় শুইয়া। গায়ে কোথাও আঘাতের চিহ্নও নজরে পড়িতেছে না, অথচ রক্তে কাপড় ও সেমিজটি একেবারে লাল হইয়া গিয়াছে। রক্তও তাজা, তখনও কালো হইয়া উঠে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হারাধনের দোকান ঘরের মেঝেয় এই রক্তকাণ্ড, অথচ সে কিছুই জানে না—ব্যাপার জটিল কম নয়।

পাঁচুলাল বলিল—"এক্ষুণি পুলিশ এসে যে তোমায় ধরে' নিয়ে যাবে! লাশ যখন তোমার ঘরে"—বলিতে বলিতে হঠাৎ পাঁচু বালিকাটির হাত ধরিয়া নাড়ী অনুভব করিল।

নাড়ী খুব ক্ষীণভাবে চলিতেছিল। পাঁচু মুখ তুলিয়াই জনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান দর্শকদিগকে কাতর বিনয়ে কহিল—"মশায় আপনারা কেউ চট্ করে একজন ডাক্তার ডাক্‌তে পারেন? যান্ না মশায়, দেরী কর্‌লে হয়তো মেয়েটিকে বাঁচান যাবে না।"

লোক ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। নেপথ্যে শোনা গেল—"এই দুপুর রাত্রে ডাক্তার কে ডাকে বাবা?' 'চল হে রামু চল।' 'ও মশায় যান্ না, একজন ডাক্তার ডেকে আসুন্ না? ঐ লাল বাড়ীটাতেই আছেন একজন এম্ বি" ইত্যাদি। ভীড় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। হারাধন ঠক্ ঠক্ করিয়া কেবল কাঁপিতেছিল—আর তাহার দুইচক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রুধারা বহিতেছিল।

পাঁচুলাল জনতা ভাঙ্গায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। হারাধনকে মেয়েটির মাথায় বাতাস করিতে বলিয়া, পাঁচু নিজেই ডাক্তার ডাকিতে গেল এবং অনতিবিলম্বেই একজন ডাক্তার লইয়া আসিল।

রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন "এই মেয়েটির উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েচে। হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল। আর কিছুক্ষণ বিলম্ব করলে হয়ত আর একে বাঁচান যেতো না। আপনি খুব সময়ে আমায় পাকড়াও করেচেন।"

এ অপরিচিতা মেয়েটি কে? কোথায় বাড়ী? কি জাতি? কি করিয়া এখানে আসিল? কেহই কিছুই জানে না।

ডাক্তারবাবুর নিকটেই বাড়ী; বাড়ী হইতে তিনি তাড়াতাড়ি একখানি পরিষ্কার কাপড়, কিছু গরম দুধ, গরম জল ও ঔষধ আদি লইয়া আসিলেন। মেয়েটিকে মুছাইয়া পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া, তাহার গলায় খানিক গরম দুধ ঢালিয়া দিয়া ফুঁড়িয়া এক পিচকারী ঔষধ তাহার শরীরে ঢুকাইয়া দিলেন। হারাধনের একখানি তক্তপোষের উপর তিন জনে ধরাধরি করিয়া বালিকাকে শোয়াইয়া ডাক্তারবাবু একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া কপালের ঘাম মুছিলেন। পাঁচুলালও আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। হারাধনের মুখ অনেকটা প্রফুল্ল হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঢং করিয়া গির্জ্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। হারাধনের বিহ্বল ভাব অনেকটা কমিয়াছে দেখিয়া, পাঁচুলাল জিজ্ঞাসা করিল—

"এইবার বলতো হারাধন ব্যাপারখানা কি ?"

হারাধন বলিল—"ঠিক সন্ধ্যের পর, প্রায় ন'টা আর কি, চার পাঁচজন লোক এসে বল্লে যে ঘণ্টাখানেকের জন্য পাল্কীটা একবার ভাড়া চায়। আমি বল্লাম বেশ নিয়ে যাও। তিন টাকা ভাড়া হ'ল। দু'টাকা আগাম দিয়ে, তারা পাল্কী নিয়ে চলে গেল।"

পাঁচু ও ডাক্তারবাবু এক সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোক-গুলোকে চেনো তুমি ?"

হারাধন বলিল, "আজ্ঞে না বাবু, কাউকেই আমি তাদের চিনি না। এমন কত লোক আসে পাল্কী নিয়ে যায় আবার দিয়ে যায়, আমি আর কাকে চিনি বলুন ? এই কোল্‌কাতা সহর কে কাকে চেনে ? তবে তারা উড়ে বেহারা নয়, বাঙ্গাল মোচলমান্ বলেই বোধ হ'ল।"

"আচ্ছা—আচ্ছা, তারপর ?"

"আজ্ঞে তারপর আর কি, পাল্কী নিয়ে গেল। রাত প্রায় ১১টা কি সাড়ে এগারটার সময় পাল্কী ফেরৎ নিয়ে এল। বল্লে কোথায় রাখব ? আমি ঐ দোকানের বাইরে ঐ খানটা দেখিয়ে দিয়ে বল্লাম—ঐ খানে

রাখ। তারা পাল্কী নামিয়ে রেখে বাকী এক টাকা ভাড়া শোধ করে দিয়ে চলে গেল। তারপর দোকান বন্ধ করবার সময়, পাল্কীখানা সরিয়ে একপাশ করে রাখতে গিয়ে দেখি যে বড্ড ভারি ঠেকে! দরজা দুটো আধকপাটে করে দেওয়া ছিল। খুলেই:দেখি এই লাশ। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—তাই শুনে লোক জড় হ'ল। লোকেরাই ধরাধরি করে মেয়েটাকে বের করে আমার মেঝেয় শোয়াল, আর দাদাবাবু আপনিও খানিক পরে এসে হাজির হলেন।"

রোগিণী অস্ফুট কাতর স্বরে 'ওঃ' করিয়া নড়িল। ডাক্তারবাবু তড়াক করিয়া উঠিয়া গিয়া নাড়ী ও বুক পরীক্ষা করিয়া একটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই বালিকা নয়ন মেলিয়া ভীত চকিত দৃষ্টিতে চাহিল। পাঁচুলাল তখন রোগিণীর দেহে উত্তাপ দিতেছিল।

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কেমন বোধ হচ্ছে তোমার?"

রোগিণীর মুখভাবে ও চাহনিতে একটা সকরুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল, একটা নিদারুণ ভয়ে তাহার হৃৎপিণ্ড আবার ঢক্ ঢক্ করিয়া সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু কোমলস্বরে বলিলেন, "ভয় কি, কোনও ভয় নেই। চেয়ে দেখ আমরা কে। তোমার অসুখ করেচে—তাই তোমায় আমরা ভাল করচি। আমাদিকে কোনও লজ্জা বা ভয় করবার কারণ নেই। আমরা সব বুঝেচি। তুমি এখন নিরাপদ!"

বালিকার ভয় তবু গেল না। তাহার চক্ষু দুইটি ভীতিবিহ্বল হইয়া কেবল এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল। নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। যেন হাঁপাইতেছিল।

ডাক্তারবাবু দেখিলেন যে রোগিণী এত ভয় পাইয়াছে যে, তাহা শীঘ্র যাইবার নয়। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা মা, তুমি নির্ভয়ে ঘুমোও। কিছু বলতে হবে না।" এই বলিয়া আর একটি ঔষধ ফুঁড়িয়া দিয়া পাঁচুলালকে কি করিতে হইবে উপদেশ দিয়া তিনি রাত্রির মত বিদায় লইলেন।

হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া, আড়ি-মুড়ি ভাঙ্গিয়া হারাধন একটু গা গড়াইতে গিয়া অনতিবিলম্বেই তুমুল নাসিকাধ্বনি জুড়িয়া দিল। বিনিদ্র পাঁচুলাল নীরবে রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খুব ভোরেই ডাক্তারবাবু হারাধনের দোকানে আসিয়া উপস্থিত পায়ে বাথশ্লীপার ও কাছাটি সম্মুখে কোঁচার উপর গোঁজা, গায়ে গেঞ্জি। রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন—

"তাই ত পাঁচুবাবু, আজকে যে আবার অন্য সব উপসর্গ দেখা দিয়েচে দেখচি। গোল বাধালে তা'হলে।"

পাঁচুলাল আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়া আর্ত্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রকম? কি হয়েচে?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"জ্বর খুব প্রবল, ব্রেন্ ও (মস্তিষ্ক) ভাল নয়। অত্যাচারে হার্ট তো খারাপ হয়েচেই—তাই ত…এত বড় "শক্"—আহা ছেলেমানুষ…হবারই তো কথা।"

পাঁচুলাল বলিল—"তবে উপায়?"

"উপায় আর কি, হাঁসপাতাল।"

পাঁচুলাল চিন্তিত হইয়া বলিল—"হাঁসপাতাল! হাঁসপাতাল ছাড়া কি আর উপায় নেই?"

ডাক্তার বাবু রোগিণীর চক্ষু নিরীক্ষণ করিতে করিতেই উত্তর দিলেন—"আর উপায় কৈ? রোগ ক্রমশঃ Serions (কঠিন) হচ্ছে, যদি সারে তো অনেকদিন সময় লাগবে। এ অবস্থায় এখানেও তো রাখা যায় না—Nurse (শুশ্রূষা) করবে কে বলুন?"

পাঁচুলাল কহিল—"তা তো বটেই—তবে হাঁসপাতাল গেলে যে আবার পুলিশ-কেশে পড়তে হবে। এর সম্বন্ধে যে আমরা কিছুই জানি না—এই যে মহাবিপদ।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তা-ও তো ঠিক। আচ্ছা—আসচি। বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেলেন।

হারাধন ভীতিবিহ্বল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদাবাবু, তবে উপায়? আমি গরীব মানুষ—"

বাধা দিয়া পাঁচুলাল কহিল—"চারজন বেহারা নিয়ে এস। বাড়ী নিয়ে যাব।"

হারাধন অকুলে কুল পাইল। বেহারা আনিতে ছুটিল। ডাক্তার বাবু ঔষধ লইয়া পুনরায় আসিলেন।

ঔষধাদি খাওয়াইয়া, ফুঁড়িয়া বস্ত্রাদি বদ্‌লাইয়া রোগিণীকে একটু গরম দুগ্ধ পান করাইয়া, ডাক্তার বাবু উঠিলেন। হারাধনও চারিজন উড়িয়া বেহারা সহ পৌঁছিল।

রোগিণীকে ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে উঠাইয়া পাঁচুলাল আগে আগে চলিল, পাল্কী আস্তে আস্তে তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

হারাধন "হরি রক্ষা কর্‌লে" বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে মুক্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, দোকানের মেঝেয় গোবর লেপিয়া অপবিত্রতা দূর করিতে মনোনিবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপর্য্যুপরি উনিশ দিন দিবারাত্র জাগিয়া অক্লান্তভাবে শুশ্রূষা করিয়া পাঁচুলাল রোগিণীকে আরাম করিল। আজ ডাক্তারবাবু ভাত দিতে বলিয়া গেলেন। রোগিণী নিরাময় ও বিপন্মুক্ত, কিন্তু বড় দুর্ব্বল।

এই অজ্ঞাতকুলশীলা, অত্যাচারিতা রুগ্না বালিকাকে গৃহে আনিয়া অবধি সংসারে এক মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

হরলাল ও পাঁচুলাল দুই সহোদর ভাই। হরলাল অপেক্ষা পাঁচু প্রায় দশ বৎসরের ছোট। পাঁচুর বয়স প্রায় পঁচিশ।

গৃহের কর্ত্তা নামে হরলাল থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে গৃহ ও গৃহকর্ত্তারও কর্ত্রী ছিলেন তাঁহার স্ত্রী পার্ব্বতী ঠাকুরাণী। বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকুরাণী ছিলেন পুত্রবধূর নিকট তটস্থ। ভয়ে জোড়হস্ত—এমনি তাঁহার দাপ! পার্ব্বতীর বৃদ্ধা মাতাও পরিবার ভুক্তা।

হরলালের দুইটি কন্যা—বড় আভা ও ছোট বিভা, বয়স যথাক্রমে দশ ও আট এবং ছোট একটি পুত্র; তাহার বয়স পাঁচ, নাম জগন্নাথ, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মানসিকে জন্ম।

হরলাল লোকটি নিরীহ ভালমানুষ ও গোবেচারা হইলেও, কখনও পত্নীভীতি নিবন্ধন তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। এই জন্য যখন তখন পার্ব্বতী ঠাকুরাণী তাঁহার স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায় নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দিতেন—কিন্তু

হরলালের তাহাতে দোষ সংশোধন হইত না দেখিয়া তিনি স্বামীটিকে নাবালক শিশু ভাবিয়া তাড়না করিতেন। হরলাল বিনা বাক্যব্যয়ে বাহিরের ঘরে উঠিয়া গিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ধূমপান করিতেন। স্ত্রীর সহিত উক্তরূপ অহিংস অসহযোগে (Non-violent Non-cooperation) সেই জন্য কোনও দিনই স্বামী-স্ত্রীতে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে নাই।

পার্ব্বতীর ধারণা যে অন্য সব স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর উপর তাঁহার অধিকার কিছু অধিক, কারণ তাঁহারই পিতার অর্থে হরলাল বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন এবং পার্ব্বতীর পিতার অন্য কোনও সন্তান সন্ততির অভাবে, হরলালের পুত্র জগন্নাথই সব পাইয়াছে, শ্বশুর বাড়ীর প্রাপ্ত সম্পত্তি সব বিক্রয় করিয়া সেই অর্থেই হরলাল কলিকাতায় এই বাড়ীখানি কিনিয়াছেন, ছোট ভাইকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন এবং কাজকর্ম্ম করিয়া সংসার চালাইতেছেন। কাজেই পার্ব্বতীর ধারণা যে এই সংসার তাঁহারই অর্থে চালিত হইতেছে, তিনিই মালিক। তাঁহার স্বামী শ্বশুর দেবর সকলেই তাঁহার আশ্রিত।

পাঁচুলাল যেদিন এই হতভাগিনীকে লইয়া বাটী আসিল—সেদিন গৃহে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। গৃহে যখন এই অনাচারের বিরুদ্ধে পার্ব্বতীর পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করা হইল তখন হরলাল বারান্দায় কোণে মুখ ধুইতেছিলেন। পাঁচু গিয়া দাদাকে যাহা জানিত সকল কথা নিবেদন করিল। পার্শ্বে তোয়ালে হাতে করিয়া পার্ব্বতী দাঁড়াইয়াছিল, সেও শুনিল। শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—"ভদ্রলোকের বাড়ী কি এই সব আনে? ছি ছি ছি!"

গত রাত্রি হইতে অনুপস্থিত পুত্রের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠিতা জননীও

ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন এবং নীরবে সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন।

পাঁচু বলিল—"ভদ্রলোকের বাড়ী বলেই তো এনেচি বৌঠান্। ছোটলোকেই যে এই কাজ করেচে।"

পার্ব্বতী হুঙ্কার দিয়া বলিল—"আর ঢং কর্‌তে হবে না, আমার কত ভাগ্যে মাদুতে-জুদুতে ঐ একটা পোকা—ওর যে এতে অমঙ্গল হবে। পাঁচটা পাশ করেচ, এ কথাটা বোঝ না?"

পাঁচু প্রসন্নভাবে বলিল—"ভগবানের এতে আশীর্ব্বাদই পাবে, বৌঠান! তিনি পতিতপাবন্—পতিতের সেবাই তাঁর সেবা।"

পার্ব্বতীর কথাগুলি ভাল ত' লাগিলই না, বরং বিপরীত ফল হইল। তিনি তীব্র ঝঙ্কারে ঝাঁজিয়া উঠিলেন—"হাঁ, তাই বলে ঐ মোচড়মানে জাত দিয়েচে, ঐ মেয়েটাকে সেবা কর্‌তে হবে? ওর ধিক্ জীবনে। ওকে গলা টিপে মেরে ফেল গে—বাঁচিয়ে আর কেন কেলেঙ্কারী বাড়াও ঠাকুরপো? আর যদি ওর দুঃখে তোমার প্রাণ এমনি গলেই থাকে, তবে গলায় গেঁথে বাসা ভাড়া করে ওকে রাখ গে। আমার এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় ওর ঠাঁই হবে না, বাড়ী ঢুকিয়েচ কি আমি খুনোখুনী কর্‌ব, ব'লে রাখচি কিন্তু।"

পাঁচু বলিল, "সেকি কথা বৌঠান্!"

পার্ব্বতী বাধা দিয়া সপ্তমস্বরে গলা চড়াইয়া কহিলেন—"বলি চোখের মাথা তো খাও নাই, আমার দু দু'টো আইবুড় মেয়ে আছে, দেখচো? এ-সব পথের মড়া ঘরে আন্‌লে, ওদুটোর আর বিয়ে হবে কি? না আমাদের বাড়ী আর কোনও লোক খাওয়া-দাওয়া করবে? তোমার কি? এ সংসার ত' আর তোমার নয়, আমার! তুমি লেখাপড়া শিখে পাঁচ

পাঁচটা পাশ করে—না, পাঁশ করে—ধিঙ্গি হয়েচ! আমার এতগুলো টাকাই জলে ফেল্লে। ভাল চাক্‌রী হ'ল—কোথা চাক্‌রী বাক্‌রী কর্‌বে, বিয়ে থা দোব, ঘরকন্না কর্‌বে—না গান্ধীর দলে ঢুকে চাকরী ছেড়ে চট্ পরে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছ—আর আমার ভাত মার্‌চ দু'বেলা। কে তোমার চিরকাল পিণ্ডি জোগাবে, বল তো?"

পাঁচুর মাতা অলক্ষ্যে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিলেন। ইত্যবসরে হরলাল কাপড় ছাড়িয়া "এস ভাই" বলিয়া পট্‌পট্ করিয়া নীচে নামিয়া গিয়া, বাহিরে অতিথিদের জন্য যে একটি ঘর ছিল সেইটি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"এস সবাই মিলে ধরাধরি করে নামিয়ে ঐ ঘরে শোয়াই আগে।"

পাঁচুলাল তাহার ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃজায়া উভয়কেই বিলক্ষণ জানিত এবং ঠিক এইরূপই যে ঘটিবে তাহা সে পূর্ব্বেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল।

হরলাল কথা খুব কমই কহিতেন। রোগিণীকে শোয়াইয়া ঝিকে ডাকিয়া ইহার জন্য একজন ঝি ঠিক করিয়া, উপরে গিয়া রোরুদ্যমানা চীৎকার-পরায়ণা পত্নীকে বলিলেন—"সকাল বেলায় বেশী চেঁচিও না। নীচে বাইরের ঘরে রোগীর যা যা দরকার পাঁচু বল্‌বে, সব যেন ঠিক ঠিক দেওয়া হয়। কোনও ত্রুটি না হয়, সাবধান।"

হরলালের মুখ গম্ভীর—আসন্ন বর্ষণোদ্যত পুঞ্জীভূত ঘনকৃষ্ণমেঘের মত বিদ্যুৎগর্ভ—যাহা এখনই বিরাট গর্জ্জনে বিশ্বধ্বংশী বজ্র সৃষ্টি করিতে পারে। জীবনে দুই একবার তাহা অনুভবও করিয়াছেন। তাই হঠাৎ হরলালের কথায় পার্ব্বতী একেবারে মন্ত্রাবিষ্টের মত স্তব্ধ হইয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"আচ্ছা।" হরলাল কাজে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রথম পথ্যের পর পাছে রোগিণী ঘুমাইয়া পড়ে, এই জন্য তাহার কাছে বসিয়া গল্প করিতে পাঁচুলাল বাড়ীর সকলকেই অনুরোধ করিয়া যখন ব্যর্থকাম হইল, তখন সে নিজেই তাহার কাছে বসিয়া থাকিবে স্থির করিল।

রোগ যখন খুব বেশী ছিল, তখন পাঁচুলাল রোগিণীর কাছে সর্ব্বদাই থাকিত। কিন্তু পীড়া যেমন কমিতে লাগিল পাঁচুলালও এঘরে তেমনি বিরল হইয়া উঠিল। হরলাল রোগিণীর জন্য যে একজন ঝি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে-ই কাছে থাকিত। আর নিজে যখন তখন আসিয়া রোগিণীর কাছে বসিতেন ও খোঁজখবর করিতেন।

বেলা প্রায় ১১টা। আষাঢ় মাস—আকাশে খুব মেঘ করিয়াছিল। হরলাল কাজ হইতে বাড়ী আসিয়াই রোগিণীর ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাত খেয়েচ মা?"

রোগিণী বালিশে ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিল। সে সসঙ্কোচে ও সলজ্জভাবে উত্তর দিল—"আজ্ঞে হাঁ।"

হরলাল চতুর্দ্দিকে চাহিয়া কাহাকেও না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, ঘরে যে কেউ নেই! তুমি একলা থাক্‌লে তো ঘুমিয়ে পড়বে মা! ঝি কোথা গেল?"

রোগিণী নীচে পানে চাহিয়া সবিনয়ে বলিল—"ঝি নাইতে গেছে

গেছে। বলে গেছে তার ফিরতে আজ একটু দেরী হবে, তা আমি ঘুমুবো না। আপনি স্নানাহার করুন্ গে।”

হরলাল “পাঁচুলাল” বলিয়া ডাকিতেই পাঁচুলাল ছুটিয়া আসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি খেয়েচ?” পাঁচুলাল উত্তর দিল—“আজ্ঞে হাঁ।” হরলাল বলিলেন—“তুমি তবে এইখানে একটু ব’স ঝির আস্‌তে দেরী হবে। তোমার যদি কোন কাজ থাকে, বাইরে যাও—তবে আমাকে ডেকে দিয়ে তবে যেও। যেন রোগীকে একলা ফেলে যেও না।” কথা কয়টি বলিয়াই কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া হরলাল উপরে চলিয়া গেলেন।

পাঁচুলাল আস্তে আস্তে আসিয়া ঘরে একখানি চেয়ারে বসিল। হাতে একখানি “অমৃতবাজার পত্রিকা” ছিল—পড়িতে লাগিল।

রোগিণী আড়চোখে পাঁচুলালের পানে একবার তাকাইল—পাঁচু পাঠে তন্ময়। আবার চাহিল, আবার চক্ষু নামাইল, আবার চাহিল, এবার আর চক্ষু ফিরিল না। সেও তন্ময় হইয়া পাঁচুলালের গৌর মুখখানির উপর সব ভুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ পাঁচুর সঙ্গে চারি চক্ষের মিলন হওয়ায় লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাতেই পাঁচুলাল জিজ্ঞাসা করিল—“ভাল কথা, তোমার পরিচয় তো নেওয়া হয় নাই!

শরৎপ্রভাতে শেফালী শাখা নাড়া দিলে যেমন ঝর ঝর করিয়া পুষ্পবৃষ্টি হয়, এই প্রশ্নে বালিকারও তেমনি অশ্রুবৃষ্টি হইল।

পাঁচুলাল কহিল—“তা কান্না কিসের? অসুখ তো ভাল হ’য়ে গেছে। এইবার একটু সবল হলেই তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেবো’খন্।”

কিশোরীর অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়িল। পাঁচুলাল ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না—বালিকা কাঁদে কেন।

পাঁচু প্রশ্ন করিল—"তোমার নামটি কি ?"

ধরা গলায় বালিকা উত্তর দিল—"শ্রীমতী সুষমা বালা দেবী।"

"তোমাদের বাড়ী ?"

"আমাদের বাড়ী রংপুর জেলায় কুসুমপুর গ্রামে।"

"বাড়ীতে তোমার আর কে আছে ?"

"আমার বাবা, মা, এক দিদি, দুই বোন্ ও একটি ছোট্ট ভাই।"

"তোমার বাবার নাম কি ? তিনি কি করেন ?"

"আমার বাবার নাম শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি যাজকতা আর পৌরহিত্য করে থাকেন। তিনি বড় গরীব।" বলিয়া সুষমা আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঁচুলাল জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার দিদিদের সব বিয়ে হয়ে গেছে ত' ?"

সুষমা অবনত মস্তকে বাম তর্জ্জনীতে অঞ্চলাগ্র জড়াইতে জড়াইতে নীরবে উত্তর দিল—"শুধু দিদিরই বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের ৮মাস পরেই তিনি বিধবা হয়েছেন।"

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে পাঁচুলাল অবগত হইল যে, গোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি গরীব। যাজকতা ও পৌরহিত্য করিয়া যৎসামান্য তিনি পান, তাহাতে তাঁহার সংসার অতি কষ্টে চলে। এই দরিদ্রতা-নিবন্ধন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে এক বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিয়া কোনও রকমে জাতি রক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। সুষমার

ছোট ভগিনী দুইটিও যথাক্রমে ১১ ও ৯ বৎসরের। ভাইটি মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স্ক।

পাঁচুলাল এই দুঃখী পরিবারের করুণ কাহিনী শুনিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

সুষমা এই পরদুঃখ-কাতর শান্ত সুন্দর যুবকের অকৃত্রিম সহৃদতায় কি যে বলিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, অন্তরে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। সে যতই চাপিতে প্রয়াস পায়, ততই তাহার অশ্রু বেগে ছুটিয়া বাহির হয়। তাই সে নির্লজ্জের মত কেবল আকুল হইয়া কি একটি কথা বলিবার জন্য পাঁচুলালের মুখপানে বারংবার চাহিতেছিল, কিন্তু মুখ কিছুতে ফুটিল না। কি কথা তাহা সে নিজেই ভাল বুঝে নাই, কিন্তু না-বুঝা সেই কথাটি বলিতে পারিলেই তাহার বুক হইতে মস্ত একটা বোঝা যেন নামিয়া যায়। এই অকথিত কথাটা একটা বড় কাঁটার মত তাহার প্রাণে বিঁধিয়া তাহাকে বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দুই ভাইয়ের এত স্নেহ এত যত্ন এত করুণা, এই কাঁটাটিকে যেন দিন দিন আরও শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিতেছিল। এই সোহাগ ও আদরে তাহার লজ্জা সুগভীর ব্যথার মত দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছিল। এত সুখ এক অনির্ব্বচনীয় বেদনায় টন টন্ করিতে লাগিল।

পাঁচুলাল দেখিল, মেয়েটি সুশিক্ষিত এবং ব্যবহার নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের মতও নয়। বলিল—"কাল তোমার বাবাকে একখানা পত্র লিখে দিই, ত'াহলে তিনি এসে তোমায় নিয়ে যাবেন।"

সুষমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র, কিছুই বলিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"তুমি কলকাতায় এসে পড়লে কি করে, মা?"

হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘরে হরলাল, তাঁহার মা ও পার্ব্বতী উপবিষ্ট, দুয়ারে পাঁচুলাল দাঁড়াইয়া।

সুষমা প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত হইয়া অধোবদনে কাঁদিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না।

হরলালের মা বলিলেন—"কান্না কি? ছি মা—বল যা ঘটেচে, বল'—তাতে আর লজ্জা কি?"

সুষমা তবু নীরবে ফুলিতেছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"আমার বাবাকে আপনারা পত্র লিখেছিলেন, কোনও উত্তর এল?"

মা কি বলিতে যাইতেছিলেন, হরলাল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন—"না, এখনও কোনও উত্তর আসে নাই। তুমি বলত মা ব্যাপারটা কি হয়েছিল? আমাদের কাছে কোনও কথা গোপন করে আর ফল কি? আমাদিগকে তোমার আপনার লোক মনে করতে কোনও আপত্তি আছে কি?"

সুষমা তাড়াতাড়ি অপরাধীর মত সকরুণ মিনতিমাখা কম্পিত স্বরে বলিল—"আপনাদের কাছে আবার গোপন? একথা মনেও করবেন না—আপনারা আমার প্রাণদাতা বাপ মা। তবে আমার মত হতভাগিনীকে না বাঁচালেই ভাল করতেন।"

মা বলিলেন—"তা সে কথা যাক্, তুমি ঘটনাটা বল।"

সুষমার সেকথা স্মরণ করিতেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল। সেই লজ্জার কথা, সেই সর্ব্বনাশের কথা তাহাকে নিজ মুখে বলিতে হইবে। অথচ না বলিলেও নয়।

সুষমা কহিল—"সেদিন পূর্ণিমা। বাবা মাঝেরগাঁয়ে সত্যনারায়ণ দিতে গিয়েছিলেন, ফির্‌তে অনেক রাত্রি হবার কথা। মার ভয়ানক জ্বর, দিদি পূর্ণিমার উপোস করে আমার ভাইটিকে নিয়ে ছিলেন, আমি রান্নাবান্না কোরে বোন্‌দের খাইয়ে, মাকে সাগু দিয়ে, গ্রামের নদীতে গা ধুতে, আর এক কলসী জল আন্‌তে ঘাটে গেলাম। রাত্রি তখন প্রায় আটটা। ঘাট হতে কেবল পাড়ের উপর উঠেচি, আর দেখি আমাদের গাঁয়ের মুরাদ শেখ, আবু মোড়ল, কছিমুদ্দি, আর ছমুমিঞা সেইখানে দাঁড়িয়ে। ত'াদিকে দেখে আমার গাটা কেমন ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ল কিন্তু কিছু বলবার আগেই, মুরাদ এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াল, আর আবু একটা হাত ধর্‌ল—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, অমনি কছিমুদ্দি ও ছমু এসে তাদের চাদরে করে আমার মুখ এমন করে বেঁধে ফেলল যে আমি আর টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করতে পারলাম না। এদের কাছে একখানা মস্ত ধারালো ছোরা ছিল—সেখানা আমার বুকের উপর ছুঁইয়ে তারা গর্জ্জে উঠল—যদি চেঁচাবি তো এই, একেবারে। প্রাণের ভয়টাই তখন আমার বড্ড বেশী হল, আমি আর চেঁচাতে পারলাম না। ছুটে পালাতে গেলাম, দু'জন লাফিয়ে গিয়ে আমায় বুকে পিঠে ও মুখে কিল চাপড় মেরে আমায় ধরে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেল্ল। আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল—আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তারপর

জ্ঞান হয়ে দেখি—দিন, ঝাঁ ঝাঁ করচে রোদ্দুর, কোন্ একটা গাঁয়ে ছোট একটা বাড়ীতে, এক ঘরে একখানা চাটাইয়ের উপর আমি শুয়ে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পালাব মনে করে যেমন ঘরের বার হয়েচি, অমনি দেখি দুয়ারে সেই পাষণ্ডরা বসে তামাক খাচ্ছে, আর কি জটলা করচে। তাঁদিকে দেখে—আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। আমাকে দেখে তারা বাঘের মত লাফিয়ে এসে আমার টুটি চেপে ধরে সেই ঘরের মধ্যে বন্ধ করে, বাইরে হতে শিকল টেনে দিলে। কতক্ষণ পরে একটা আধবুড়ো মাগী আমার জন্যে ডাল ভাত তরকারী এনে খাওয়াবার জন্যে কত সাধল—আমি তা স্পর্শও করলাম না—তাতে সে নানা কুকথা বলে শাসিয়ে বাইরে যেতেই, দুপদাপ করে ঐ দস্যি চারজন আমার ঘরে এসে জবরদস্তি আমার মুখে সেই ভাত ঢুকিয়ে দিলে। আমি থু থু করে তাদের মুখেই ফেলে দিলাম। তারা "এইবার জাত তো মেরেচি" বলে করতালি দিয়ে অট্টহাস্য করে উঠল। আমি প্রাণপণ চীৎকারে কত চেঁচালাম, কত কাঁদলাম, কত ভগবানকে ডাকলাম—কিন্তু কেউই আমায় সাহায্য করতে এল না।

"সন্ধ্যা লাগতেই আবার সেই মাগী ভাতের থালা নিয়ে এল, তাকে আমি যা মুখে এল তাই বলে গালাগাল দিলাম। সে রেগে বেড়িয়ে গেল। তারপর সেই নরাধমরা এসে আমায় রাত দুপুর পর্য্যন্ত বিরক্ত করে বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেল।

"আমার নিস্তার নেই ভেবে শেষে পরণের কাপড় খুলে আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করলাম—গলায় ফাঁসি লাগল না। ভগবান্ আমায় মরেও নিষ্কৃতি পেতে দিলেন না।

"তার পর দিন আমায় নিয়ে এল কল্‌কাতায়। আমার জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হলে দেখ্‌লাম্ ছোট একটা কুঠরীতে মেঝের উপর আমি শুয়ে। উঠে বসতে পারি না—বসতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখি। চীৎকার করতে গেলাম, আওয়াজ বেরুলো না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

"মুরাদ এসে আমায় বোঝাতে লাগ্‌ল, যে আমি মুসলমান হয়ে যেন তাকে বিবাহ করি। যদি আমি স্বেচ্ছায় রাজী না হই, তবে আমার উপর তারা জোর করে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবে, ইত্যাদি। আমার শরীর তখন অবসন্ন, দুঃখে, ক্ষুধায়, পিপাসায় আমি মৃতপ্রায়, তবুও তাকে আমি এক লাথি মার্‌লাম। সে তা বরদাস্ত না করে আমার বুকে এমন এক ঘুঁসি মারল যে আমার সর্ব্বশরীর একেবারে ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। কতখানি যে লাগ্‌ল তা বোঝবার আগেই আবার আমার জ্ঞান লুপ্ত হ'ল।

"যখন চাইলুম, তখন দেখি রাত্রি, কত রাত্রি তা বল্‌তে পারি না। তখন আমি কথা বলতে পারি না। তারা অনেক অনুনয় বিনয় অনুযোগ করে, গালিগালাজ আরম্ভ করলে, তাতেও আমি আত্মদান যখন করলাম না, তখন তারা চার পাঁচজন মরদ......"

সুষমা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হরলাল আপনার কোঁচার অগ্রভাগ দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"কেঁদো না মা, এতে আর কি হয়েচে? তোমার কোনও দোষ নাই।" তাঁহার চক্ষুও জলে ভরিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নীরব। সুষমা বলিল—"এরপর চক্ষু মেলেই দেখি, আপনার ভাই আমায় শেক্ দিচ্ছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"আর যখন কোনও উপায় নেই, তখন খৃষ্টান মিশন ছাড়া আর ওর গতি কি ?"

হরলালের কথা শুনিয়া মাতা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বামুনের ঘরের মেয়ে, যার-নাম-মেয়ে, রূপে গুণে, কাজে কর্ম্মে লেখাপড়ায়, আহা এমন মেয়েকে শেষে খৃষ্টান হতে হবে বাবা। আহা মেয়ে তো নয় যেন মা ভগবতী !"

পার্ব্বতী বলিলেন "তা আর ভেবে কি হবে, বল ? হিঁদুর ঘরে ও-মেয়েতো আর কেউ নেবে না !"

হরলাল বলিলেন—"আমিও ত' কোন কসুর করি নাই। চিঠি লিখলাম,—ওর বাপ লিখলেন যে সে মেয়ে মরেচে। ভাবলাম যে তিনি আসল ব্যাপার হয় তো জানেন না—তাই নিজে গিয়ে সব বুঝিয়ে দিলাম। তাতে তিনি বললেন "মশায়, আমাদের এ পাড়াগাঁ। সে মেয়ে ঘরে নিলে আমাদের জাত যাবে। আমার আর দুটি মেয়ের বিয়ে হবে না, আমার ছেলেও চিরকাল সমাজের বার হয়ে থাকবে। তা ছাড়া আমি গরীব, পরের বাড়ী যজমানি করে খাই, আমাকে লোকে আর ডাকবে না। ফলে আমায় সগুষ্ঠি উপোস করে মরতে হবে।"

হরলালের শাশুড়ী বলিলেন—"আ মরুক্ মিন্সে। মেয়ের চেয়ে তার খাওয়া বড় হ'ল! অমন পেটে আগুণ ধরিয়ে দিক্ গে। মেয়ের দোষ কি ?"

হরলাল বলিলেন—“তা নয় মা, সে বেচারী কেঁদেই আকুল। কিন্তু পেটতো আর শোনে না, সমাজ যে এ বিষয়ে চোখ-বোঁজা। কাজেই সে নাতোয়ান্ করে কি? বড়লোক হ'ত—সমাজ তার জন্যে ব্যবস্থাও অন্য রকম দিত। গরীবেরই তো যত অপরাধ। দুর্ব্বলকেই তো লোকে মারে —পৃথিবী যে শক্তের ভক্ত।”

পার্ব্বতীকে ও অন্যান্য বাড়ীর সকলকেই সুষমা ইতিমধ্যে হাত করিয়া ফেলিয়াছিল। যে যেমন তাহাকে তেমনি স্নেহ ভক্তি সেবা করিয়া আপনার দৈন্যে আপনি সর্ব্বদা অপরাধীর মত বিনয়ে, সঙ্কোচে ও মিষ্ট ব্যবহারে সুষমা বাড়ীর লোকেদের যেমন হৃদয় জয় করিয়াছিল, তেমনি ছেলেদেরও সে একান্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলেরা নতুন দিদি বলিতে একেবারে অজ্ঞান। সুষমা ভিন্ন ছেলেদের নাওয়া খাওয়া শোওয়া কিছুই হইত না।

এমন কি পার্ব্বতী দেবী—যিনি এমন স্বামীর শাশুড়ীর ও দেবরের-ই তোয়াক্কা রাখেন না—তিনি পর্য্যন্ত সুষমাকে আর ছাড়িতে চাহেন না। ইহাতে লোকে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। যাহাকে বাড়ীর বহির্ব্বাটীতে বান দিতে সেদিন পার্ব্বতী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করিয়াছিলেন, আজ স্বাড়ী হইতে তাহাকে বিদায় দিতে তিনি একেবারে নারাজ! মেয়েটা যাদু জানে না কি?

সন্ধ্যার পর সকলে খোলাছাদে বসিয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময় পাঁচুলাল আসিয়া তথায় বসিল।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—“আর বেরুবে না কি?”

পাঁচুলাল বলিল—“আজ্ঞে না।”

মা বলিলেন—"হাত পা ধো, বসলি যে? কিছু খা; কোন্ সকালে সেই দুটো নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়েছিলি, বলতো তুই হলি কি?"

পাঁচুলাল একটু হাসিয়া উঠিয়া আপনার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সুষমা কক্ষমধ্যে শয্যা রচনা করিতেছে।

সুষমা আরোগ্যলাভ করার পর হইতে, প্রত্যেক ঘরেরই শ্রী ফিরিয়াছিল। সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত থাকিত, মায় জুতাগুলি পর্য্যন্ত ঝক্ ঝক্ করিত।

সকালে বাহির হইবার আগে হরলালকে আর জুতা কাপড় জামা ছড়ি ছাতা খুঁজিতে হইত না। ছেলেদের আর ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড় পড়িতে হয় না। কাহারও আর জামা বোতামহীন থাকে না। এখন প্রত্যেক বালিশেই ওয়াড় দেখা যাইতেছে। টেবিলে ধুলা জমে না। জানালায় জানালায় পরদা ঝুলিল। অথচ সংসারে এক পয়সা খরচ হইল না। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীত হইলেন পার্ব্বতী, কারণ ছেলে মেয়েদের চিন্তাও আর তাঁহাকে করিতে হইত না। মায়েরও পূজার যোগাড় হইতে রান্নার যোগাড় পর্য্যন্ত আর তাঁহাকে কিছুই করিতে হইত না।

মা ডাকিলেন "সুষমা, মা, পাঁচুকে খাবারটা এনে দাও তো!"

সুষমা ছাদে আসিয়া বলিল—"দিয়েচি, উনি খাচ্ছেন।"

কথাটা কি জানি হঠাৎ সকলেরই বড় মিষ্টি লাগিল। সুষমা আভা ও বিভাকে পড়াইতে গেল। এই দুই মাসে মেয়েরা তো লেখাপড়া, শেলাই ও স্তব অনেকই শিখিয়াছে, ছোটখোকা জগন্নাথেরও বর্ণ পরিচয় শেষ হইয়া গিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

হরলাল পাঁচুর ঘরে আসিয়া ধপাস্ করিয়া ঈজি চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল। পাঁচু জিজ্ঞাসা করিল।—"তামাক দেব দাদা?"

হরলাল—"দাও" বলিয়া, ঈজি চেয়ারেই অঙ্গ এলাইয়া দিলেন।

একথা সেকথার পর, হরলাল বলিল "সুষমাকে খ্রীষ্টান্ মিশনে দেওয়াই স্থির করচি, কি বল পাঁচু?"

পাঁচু কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বলিল—"তা আপনার যা অভিরুচি।"

হরলাল বলিল—"এ-ছাড়া আর কি করতে পারি বল? চেষ্টা তো সবই করেচি—তুমি তো জান সবই।"

পাঁচু গড়্গড়ায় কলিকাটি বসাইয়া দাদার পাশে চেয়ারে বসিয়া বলিল—"আজ্ঞে হাঁ। আমাদের আর দোষ কি? আমরা তো চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। আমাদের কর্ত্তব্য করেচি।"

হরলাল বলিল—"আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করেছি, পাঁচু? তুমি এই কথা বল?"

পাঁচু হরলালের স্বরে বিস্মিত হইয়া দাদার মুখপানে চাহিল।

হরলাল বলিল—"এমন রূপবতী ও গুণবতী মেয়ে হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাকে আমরা ত্যাগ করচি কেন? না সে নির্য্যাতিতা! যেহেতু তাকে আমরা রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না, এই জন্য তাকে আমাদের হিন্দুসমাজ আর স্থান দেবেন না। আমরা পুরুষ, নারীকে রক্ষা কর্‌ব বলে তার ভার নিয়েচি, কিন্তু পারলাম না—দোষ

কা'র, না ঐ নারীর! তোমাদের সমাজের এই শাস্ত্র। আর দোষও বড় সামান্ত নয়—একেবারে তাকে হত্যা করা নয়, জীবন্তে মাটীতে পুঁতে ফেলা—অর্থাৎ পরিত্যাগ করা সে একটা কুকুর বিড়ালের চেয়েও ঘৃণ্য। কুকুর বাড়ীতে থাক্‌বে, অথচ সে নারীটী নয়। ওই যুঁই ফুলটির মত মেয়েটী তার দোষ কোথায়, অপরাধ কি, একবার ভেবে দেখেচ? যে-অবস্থার সঙ্গে ওই ছোট্ট মেয়েটি লড়াই করেচে, সে অবস্থার সঙ্গে লড়াই করা কি কম বীরত্ব? ক'টা পুরুষ এমন পারে? লড়াই করতে গেলে—আঘাত লাগে, তারও লেগেচে—এই জন্যেই কি সে পরিত্যাজ্য? সেই মহীয়সী নারী আহত বলেই তাকে পরিত্যাগ করতে হবে—এই কি আমাদের এখন কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম?"

পাঁচুর বিস্ময় চুড়ান্তে পৌঁছিল। স্বল্পভাষী, ভাবলেশশূন্য, অনমনীয়, হিসাবী তাহার দাদার এ কি ভাবান্তর! দাদার যে কি ইচ্ছা তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে নীরবে নিদারুণ বিস্ময়ে ভ্রাতার মুখপানে অপলক নেত্রে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

হরলাল বলিলেন—"তুমি অসহযোগী হয়েচ,—দেশের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে। শাসনতন্ত্র আমাদের বাইরের জিনিষ, সেটা শোধন কর্‌বার আগে, তোমার ভিতরের জিনিষ যা নৈলে জাতি বাঁচে না, সেই সমাজ ও ধর্ম্ম শোধন কর'না কেন ভাই? আগে বাঁচ, মানুষ হও, তারপর শাসনতন্ত্রের দোষগুণ বিচার কর্ত্তে বসো। এই সমাজের একজন হয়ে, তোমার বাঁচতে লজ্জা লাগে না?"

পাঁচুলাল সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌তে আজ্ঞা করেন তবে দাদা?"

হরলাল বলিলেন,—"এই হিন্দুসমাজের সঙ্গে আগে নন্‌কো-অপারেশন্ (অসহযোগ) কর। আগে তুমি নিজে ন্যায়বান্ সহৃদয় বিবেচক ও সত্যবাদী হও—তারপর অন্যকে তাই হ'তে উপদেশ দিও। বিদেশী বিধর্ম্মী রাজা তোমাদের উপর কী অন্যায় করে? আর যদি করে তো সেটা বরং স্বাভাবিক, কিন্তু তুমি তোমার নিজের ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনের উপর কি কম অমানুষিক অত্যাচার কর্‌চ? ভেবে দেখ দেখি? তাই বলি, আগে তোমার জাতীয় অন্যায়, পীড়ন, অত্যাচার বন্ধ কর—তারপর দেশের রাষ্ট্রীয় দোষ সংশোধন কর্‌তে পারবে এই অসহযোগী হ'য়ে।"

পাঁচুলাল কহিল—"আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, নিশ্চয়ই পারব।"

হরলাল উঠিয়া গেলেন।

পাঁচুলাল মোহাবিষ্টের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাথার মধ্যে কথাগুলি একটী নূতন আলোক জ্বালাইয়া দিল।

অকস্মাৎ তাহার ঘরে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে তাহার চমক ভাঙ্গিল।

মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার কপালে চন্দনের ফোঁটা ও মাথায় ধান্য-দূর্ব্বার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। কক্ষান্তরে সজোরে শঙ্খধ্বনিতে আসন্ন উৎসবের সমারোহ ধ্বনিত হইল।

আভা ও বিভা আনন্দে সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আহ্লাদে কোলাহল করিয়া উঠিল—"নতুন দিদি এইবার আমাদের কাকীমা হবে রে।"